উনিশ-বিশ

আয়নার সামনে আর ভেতরে যে দুজন, তারা কি একটুও আলাদা নয়? ওই চোখ, চোখের টান, কিংবা কপালের কোণে আধভাঙা চুল এবং সব মিলিয়ে উপচে পড়া এক আলো যা কিনা সমস্ত শরীরকে জড়িয়ে রেখেছে লাবণ্য হয়ে, এসবই কি একজনের? এই আঠারো-উনিশ বছর বয়সটার? সুর্মা অপাঙ্গে আয়নাকে দেখল। তারপর ধীরে-ধীরে কাছে এগোল। আয়নার কাছে সে-ও এগিয়ে আসছে। নাকের কাছে নাক, চোখের হাসিতে ছোঁয়াছুঁয়ি, সুর্মা বুক উজাড় করে শ্বাস ফেলল আর তখনই ঝাপসা হয়ে গেল আয়নার মুখের চিবুক, ঠোঁট। জলজ বাতাস সাদা করে দিল কাচটাকে। সুর্মা হেসে উঠে সরে এল। সরে আসতেই চোখে পড়ল দরজায় স্বপ্না দাঁড়িয়ে।

'ওমা, কী করছিস? আয়নাকে চুমু খাচ্ছিস?' স্বপ্না অবাক গলায় শুধাল।

'চুমু? চোখে কী পড়েছে দেখছিলাম।' সুর্মা চটপট কথা সাজাল।

'চোখে তোর কাজল ছাড়া আর কী পড়বে! চোখ খোলা রাখলে দেখতে পেতিস তোকে নিয়ে কী কাণ্ডটাই পাড়ায় হয়ে গেল।' স্বপ্না ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল। স্বপ্নার হাসি মাড়িকে দেখায়। এ পাড়ায় ওই সুর্মার বন্ধু। একসঙ্গে সেই ক্লাস ওয়ান থেকে টুয়েলভ ক্লাসে এসেছে। ওরা অবশ্য নিজেরা বলে সেকেন্ড ইয়ার। স্কুলের গন্ধটাকে ঝেড়ে ফেলতে চায়। স্বপ্নার চেহারা একটু ক্ষয়াটে ফর্সা। কিন্তু খুব বুদ্ধিমতী, ইংরেজিতে বেশ ভালো।

'কী হয়েছে রে?' সুর্মা জিজ্ঞাসা করল। আজ সকালেই ওরা ফিরেছে রাঁচি থেকে। সামারের প্রায় পঁচিশ দিন ওখানে খুব হইহই করে কাটিয়ে এল ওরা। সুর্মার বাবা স্বপ্নেন্দু মাস ছয়েক আগে রাঁচিতে বদলি হয়েছেন। তিনি একাই কোয়ার্টার্সে থাকেন, সুর্মাদের নিয়ে যাননি পড়াশুনায় বিঘ্ন হবে বলে। এবার সুর্মা মা আর বোনের সঙ্গে ঘুরে এল রাঁচি থেকে। ওখান থেকে তিনখানা চিঠি দিয়েছে সে স্বপ্নাকে, উত্তরও পেয়েছে। কিন্তু তাতে তো পাড়ার কোনও উল্লেখযোগ্য খবর ছিল না।

'অতীন পাগল হয়ে গিয়েছিল'। স্বপ্না আস্তে-আস্তে বলল।

'সে কি! কবে? কী করে পাগল হল! যাঃ, সত্যি বলছিস?' একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করে বসল সুর্মা। ওর কথাটা বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

'তোরা চলে যাওয়ার দিন ছয়েক পরেই। এই তো গতকাল হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরেছে। পাড়ার সবাই জানে একথা।' স্বপ্নার মুখ গম্ভীর।

'তুই আমাকে লিখিসনি তো চিঠিতে?'

'লিখলে তোর ভালো লাগত না।'

'কেন?'

'ও তোর জন্যেই পাগল হয়েছিল।'

কথাটা কানে যাওয়ামাত্র সুর্মার শরীর অবশ হয়ে গেল। প্রথমে সে কথাটার কোনও মানে খুঁজে পেল না। অতীন তার জন্যে কেন পাগল হবে? সে কখনও

অতীনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। অতীনরা আগে ওদের পাশের বাড়িতে থাকত। এখন পাড়ার মোড়ে মিষ্টির দোকানের ওপরে উঠে গেছে। কলেজে পড়ে অতীন, পড়াশুনায় খুব একটা ভালো নয়। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই ওকে দেখে আসছে সুর্মা। ছেলেবেলায় নাকি এই বাড়িতেই সারাদিন পড়ে থাকত। ছিপছিপে লম্বা, বয়সের তুলনায় বেশ লম্বা, ইদানীং লালচে লোমে মুখ ঢাকা, চোখদুটো খুব সুন্দর। সুর্মার সঙ্গে এককালে খুব মারপিট হতো, সেই কোনকালের ছেলেবেলায়। তার জন্যে এখন পাগল হওয়ার কোনও মানে হয় না। বড় হয়ে যাওয়ার পর অতীন কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। এ বাড়িতে মাঝেমধ্যে আসে, সুর্মার মায়ের সঙ্গে কথা বলে, সামনে পড়লে সুর্মাকে দু-একটা প্রশ্ন করে এবং চলে যায়। এমনকী যেদিন রাত্রে ওরা রাঁচিতে গেল সেদিনও তো এসেছিল। সেই বিকেলে স্বপ্নেন্দু চা খাচ্ছিলেন আর সুর্মা কোন-কোন গল্পের বই সঙ্গে নেবে তাই ভাবছিল। দরজায় শব্দ হতেই কাজল বললেন, 'যা তো, দ্যাখ কে এল?'

সুর্মা দরজা খুলতেই দেখল পাজামা-পাঞ্জাবি পরে অতীন দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কি, এর মধ্যেই রেডি?'

'বাঃ, এখনই রেডি হব কেন? ট্রেন তো সেই রাত্তিরে।'

'বাচ্চা মেয়েরা সকাল থেকে তৈরি হয় যাওয়ার জন্যে।'

সুর্মা একটা কড়া কথা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় মায়ের গলা শোনা গেল, 'কে এল রে?'

সুর্মা কিছু বলার আগেই অতীন চেঁচাল। 'আমি মাসিমা।'

অতীনের পিছু-পিছু ঘরে ঢুকতেই সুর্মা শুনতে পেল স্বপ্নেন্দু বললেন, 'এই যে অতীন, কেমন আছ?'

'ভালো। আপনি?'

'ওই আর কী! ওখানে একা থাকতে কি আর ভালো লাগে! এবার ওরা যাচ্ছে, কদিন বেশ হইচই করা যাবে।'

সুর্মার মা এসে দাঁড়ালেন, 'হ্যাঁরে অতীন, আমাদের পাড়ার মোড়ে রাত্রে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে না?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'উনি চিন্তা করছেন ট্যাক্সি পাওয়া যাবে কি না।'

'ও, এই ব্যাপার। কটায় বের হবেন আপনারা? আমি ট্যাক্সি ডেকে দেব।'

স্বপ্নেন্দু যেন এইটেই চাইছিলেন, 'বাঃ, খুব ভালো। আটটায় বেরিয়ে পড়ব।'

সুর্মার মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'দ্যাখ, পারবি তো?'

অতীন হাসল, 'বাঃ, আমি কি আর ছোট আছি?' তারপরে সুর্মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই কিন্তু মাসিমার কাছছাড়া হবি না, হারিয়ে যেতে পারিস।'

স্বপ্নেন্দু বললেন, 'না-না মেয়ে আমার লেডি হয়ে গেছে, ওখানে আমি একটা খুব ভালো ছেলে দেখে রেখেছি। এবার গিয়ে লাগিয়ে দেব বিয়ে।'

সঙ্গে-সঙ্গে সুর্মা চেঁচিয়ে উঠল নাকিসুরে, 'বাবা তুমি না। ওমা দ্যাখো বাবা কী বলছে।'

সুর্মার মা হাসলেন, 'সে তো ভালোই হয়। পছন্দমতো অল্পবয়সি ছেলে যদি পাওয়া যায় তো দায় চুকিয়ে ফেলাই ভালো। সব মেয়েকেই তো একদিন না একদিন বাপের বাড়ি ছেড়ে যেতেই হবে, কী বলিস অতীন?'

এখন মনে পড়ছে তখন অতীন কোনও উত্তর দেয়নি। শুধু সুর্মার মুখের দিকে তাকিয়েছে। তার খানিক বাদেই দু-একটা কথা বলে সে চলে গেল। অন্তত সেদিন ওর কোনও পরিবর্তন চোখে পড়েনি। তবে হ্যাঁ, রাত আটটায় ট্যাক্সি নিয়ে অতীন আসেনি। স্বপ্নেন্দুকেই ট্যাক্সি ডেকে আনতে হয়েছিল। স্বপ্নেন্দু রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'ইরেসপনসিব্‌ল। করবি না তো আগ বাড়িয়ে বললি কেন? কলকাতার ছেলেদের মধ্যে কোনও ডিসিপ্লিন নেই!'

সুর্মার মা অস্বস্তি নিয়ে বলেছিলেন, 'অতীনটা তো এরকম নয়! ওকে সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি! কিছু হল কি না কে জানে!'

স্বপ্নেন্দু বলেছিলেন, 'কিছুই হয়নি। কোথাও আড্ডা মারছে। এখনকার ছেলেদের তুমি চেনো না। শোনো, ওকে অত ঘনঘন বাড়িতে আসতে দিও না।'

সুর্মা বন্ধুর দিকে তাকাল। এইতো সেদিনের ঘটনা এগুলো। এই ঘটনার জন্যে কোনও মানুষ পাগল হয় নাকি? সে এগিয়ে এসে স্বপ্নার হাত ধরল, 'কী হয়েছে আমায় খুলে বল।'

স্বপ্না ইতস্তত করল। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'এখানে নয়। মাসিমা এলে শুনে ফেলবে। তার চেয়ে তোদের ছাদে চল।'

সুর্মাদের এই ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদটায় বিকেলে যেন হাট বসে যায়। সব ফ্ল্যাটের মেয়ে-বাচ্চা সেজেগুজে চলে আসে এখানে। এক-এক দলের পৃথক আড্ডা বসে। আশেপাশের নিচু ছাদগুলোকে পরিষ্কার দেখা যায়। সুর্মা ইদানীং ছাদে উঠত না। আজেবাজে কিছু ছেলে অন্য ছাদ থেকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে এইদিকে। ছেলেদের এইরকম অসভ্যতা ভীষণ খারাপ লাগে ওর। বুড়ো-বুড়ো লোকগুলো পর্যন্ত ওর দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকায় যে গা জ্বলে যায়।

ছাদের ঠিক মাঝখানে ওরা বসল। এখন রোদ্দুর নেই কিন্তু ছায়াতে আলো মাখানো। আকাশটা আজ কাচের মতো ঝকমকে।

সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে সুর্মা বলল, 'এবার বল কী হয়েছিল?'

স্বপ্না বলল, 'তোরা রাঁচি চলে যাওয়ার তিনদিন পর ঘটনাটা ঘটল। রবিবার দিন দুপুরবেলায় আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অতীন চিৎকার করতে লাগল তোর নাম করে। মুখচোখ লাল হয়ে গেছিল, কী বীভৎস দেখাচ্ছিল ওকে।'

সুর্মা অবাক হয়ে গেল, 'আমার নাম ধরে? কী বলছিল?'

হেসে ফেলল স্বপ্না, 'আই লাভ ইউ সুর্মা, আই লাভ ইউ সুর্মা।'

'যাঃ।' সুর্মার দুই গাল বিকেলের আকাশ।

'হ্যাঁরে। আমরা তো সবাই অবাক। পাড়ার ছেলেরা ধরাধরি করে ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। শুনলাম খুব ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে ও, দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে, সারাক্ষণ গালাগালি করছে আর মাঝে-মাঝে ওই কথা বলছে। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল ওর মা।' একটু থেমে স্বপ্না বলল, 'যাই বলিস,

ওর মাকে আমার একদম পছন্দ হয় না।' সুর্মা অবশ হয়ে গিয়েছিল। কোনওরকমে কথা বলল, 'কেন?'

'কেমন যেন স্বার্থপর-স্বার্থপর। নিজের ছেলের দোষ দিল না। উলটে তোর বাবার নামে সাত-পাঁচ বলে বেড়িয়েছে।'

'আমার বাবার নামে? সেকি! কী বলেছে?'

'তোরা অ্যাদ্দিন মেশামিশি করার পর এখন তোর বাবা রাঁচিতে নিয়ে গিয়ে তোর বিয়ে দিচ্ছে। এইসব। আমি তো শুনে একদম বিশ্বাস করিনি। তোর বিয়ে হলে আমি জানতে পারতাম না, বল?' স্বপ্না তাকাল।

হাসবে না কাঁদবে, বুঝতে পারছিল না সুর্মা। রাঁচিতে যাওয়ার দিন বাবা স্রেফ রসিকতা করে যে কথাটা বলেছিল তা শুনে অতীন পাগল হয়ে গেল? এরকম কখনও হয়?

হঠাৎ স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'একটা কথা সত্যি বলবি?'

'বল।'

'তোর সঙ্গে অতীনের, মানে, লাভটাভ হয়েছিল বলিসনি কেন?'

'যাঃ।' তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে উঠল সুর্মা, 'তোকে ছুঁয়ে বলছি স্বপ্না, আমার সঙ্গে ওর কিছুই হয়নি। ওকে তো ছেলেবেলা থেকে আমি দেখছি, কিন্তু কখনও মনের মধ্যে অন্য চিন্তা আসেনি। ইদানীং তো আমার সঙ্গে কথাও বলত না অতীন, খুব মুখোমুখি না পড়লে আমিও বলতাম না। ও যে এইসব যা-তা ভাবছে তাও আমাকে কখনও বলেনি। আমার এমন লজ্জা করছে এখন, পাড়ার সবাই কী ভাবছে বল।' সুর্মার সত্যিই লজ্জা করছিল। পাগল হয়ে রাস্তায় তার নাম ধরে চেঁচামেচি করেছে ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিল।

স্বপ্না বলল, 'ছেড়ে দে এসব কথা। এখন তো অতীন ভালো হয়ে গিয়েছে। আজ সকালেই দেখলাম খুব গম্ভীর মুখে হেঁটে যাচ্ছে। তুই যখন এসবের সঙ্গে জড়িত নোস, তখন তুই ভাববি কেন?' স্বপ্না বোঝাল।

সন্ধে ঘন হতে ওরা নেমে এল ছাদ থেকে। কদিন বাদেই একটা পরীক্ষা। স্বপ্না আর বেশিক্ষণ থাকল না। দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরে এল সুর্মা। ওর খুব ইচ্ছে করছিল মায়ের কাছে এইসব কথা খুলে বলে। অতীনের সঙ্গে তার যে কোনও সম্পর্ক নেই, বা ওইসব ভাবার মতো মন তার তৈরি হয়নি, একথা আর কেউ না জানুক মা জানে। কিন্তু কথাটা বলতে যে তার খুব সঙ্কোচ হচ্ছিল। সে অপেক্ষা করছিল, মা যদি কারও কাছে ঘটনাটা শোনে, তা হলে নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করবে, তখনই বলা সহজ।

আজকাল বাবা বেশিরভাগ সময় রাঁচিতে থাকেন। বাবার জন্যে আমার খুব মন কেমন করে! আমরা তো দুই বোন। ছোট বোন এত ছোট যে আমার বন্ধু হতে পারে না। মায়ের কাছে আমি অনেক কথা বলি, কিন্তু সব কথা বলতে পারি না। পারলে তো স্বপ্নার কথাটা বলতে পারতাম। কাল রাত্তিরে মায়ের পাশে শুয়েও যখন ঘুম আসছিল না তখনও বলতে পারিনি। একথা ঠিক, বাবাকেও কথাটা বলতে পারতাম

না। কিন্তু কিছুদিন থেকে বাবাকে আমার খুব কাছের মানুষ বলে মনে হচ্ছে। আমি যেই বড় হয়ে উঠলাম অমনি মনে হল বাবার অনেক কিছু আমার ভালো লাগে। আজকাল বাবা যখন আমার সঙ্গে রসিকতা করেন তার মধ্যে একটি বয়স্ক মত কাজ করে। এই সেদিন সন্ধেবেলায় আমরা গাড়িতে বেরিয়ে রাঁচিতে ফিরছিলাম, বাবা বললেন, 'দ্যাখ সুর্মি, আকাশটাকে দ্যাখ। যেন কলজে ফেটে রক্ত ঝরছে।'

আমার খুব ভালো লাগল। আমি বুঝলাম খুব কষ্টের রঙ মাঝে-মাঝে লাল। সূর্যের জন্যে আকাশের যে কষ্ট সেটা যে দেখছে তার মধ্যেও ছড়িয়ে গেল। বাবা এভাবে আমাকে ভাবতে সাহায্য করেন। কিন্তু মা আমার আটপৌরে, এমনিতে খুব ভালো, যতটা ভালো একজন মা হতে পারে। কিন্তু মায়ের সঙ্গে কথা বললে মনের বয়স বাড়ে না। আর এই সময়টায় বাবা রাঁচিতে চলে গেলেন বদলি হয়ে। কদিন রাঁচিতে আমি খুব সুন্দর কাটিয়েছি।

জীবনে এরকম রাত ওই প্রথম, যে রাতে আমার চোখে ঘুম আসেনি। অতীনটা এমন কাণ্ড করল কেন? আমি তো ওর সঙ্গে কখনও তেমন ব্যবহার করিনি। আমার ক্লাসের অনেক মেয়ের লাভার আছে। ব্যাপারটায় শুধু একটা ছ্যাবলামি বলে আমার মনে হল। আমাদের এই বয়সে ওসব মানায়? বাবা বলেন, সব কিছুর একটা নিয়ম প্রকৃতি বেঁধে দিয়েছে। ভোরের ছায়ার সঙ্গে বিকেলের কেমন একটা মিল আছে কিন্তু তাই বলে কি ও দুটো এক! ভোরের ছায়ায় একটা শিরশিরে আনন্দ মেশানো থাকে আর বিকেলের ছায়ায় তিরতিরে দুঃখ। কিংবা ফলের মতো। অকালে কারবাইড দিয়ে পাকালে আসল স্বাদ কি মেলে? আমাদের এখন পড়াশুনার সময়। ক্লাসের পড়া ছাড়া পৃথিবীতে এত বই আছে যা না পড়লে মানুষ হিসাবে জন্মানোর কোনও মানে হয় না। একথাটাও বাবার কাছ থেকে শেখা। পশুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ হল মানুষ রিলে রেসের মতো সভ্যতাকে বয়ে নিয়ে যায়, আর পশু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমার তাই ওসব মোটেই পছন্দ হয় না।

কিন্তু অতীনটা এমন কাণ্ড করল কেন? ও কি আমার কথা ভাবত? আমাকে, যাকে বলে ভালোবাসা, তাই বাসত? আমি তো কখনও সেরকম বুঝতে পারিনি। কাউকে ভালোবাসার কথা আমার মনেই আসেনি। অতীন এত কাছের ছেলে যে ওর সম্পর্কে এসব চিন্তা আমার মাথায় আসেনি! কোনও রক্তমাংসের পুরুষকে যদি আমি ভালোবাসি তো তিনি হলেন আমার বাবা। তারপরেই দুজন, আগে-পরে। একজন রবীন্দ্রনাথ অন্যজন জীবনানন্দ দাশ। এই দুজন মনের আকাশে একটার পর একটা তারা জ্বেলে দিয়ে যান আর বাবা সেই আকাশটাকে গড়ে দিয়েছিলেন। আমি যদি কাউকে ভালোবাসি তাহলে তাকে হতে হবে ওই তিনজনের সমান মনের মানুষ। অতীন তো সেরকম নয়। ও তো খুবই বলেছিল, একটু চোয়াড়ে। বইপত্র খুব পড়ে বলে জানি না। দুদিন সাদামাটা সিরিজ না কি ছাই ওরকম বই হাতে দেখেছিলাম। মাকে বলে মোহন দারুণ বই, ধরলে ছাড়া যায় না। তখন বাবা এখানে ছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, 'নাবালক মানসিকতার মানুষের খাদ্য ওগুলো।'

কিন্তু সেই অতীন রাস্তায়-রাস্তায় চিৎকার করবে আই লাভ ইউ সুর্মা? কোনও কারণ ছাড়াই? একি সেই খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি আমার মনের ভিতরে? যেই শুনল

রাঁচিতে গিয়ে আমার বিয়ে দেওয়া হবে অমনি সব ওলট-পালট হয়ে গেল? সেইজন্যেই কি কথা দিয়েও ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এল না? আর ওই চিন্তায় পাগল হয়ে গেল? ও কি গোপনে আমাকে এতখানি ভালোবাসত। পাগল! এরকম একতরফা ভালোবাসার কী মূল্য? কিন্তু বুঝতে পারছিলাম অতীনের জন্যে মনে কেমন একটা মায়া মিশছে। আহা বেচারা। একে কি করুণা বলে? জানি না। তবে ওকে সামনে পেলে আমি সুন্দর করে বুঝিয়ে সহজ করতাম। তার পরেই মনে হল, এসবের কী দরকার। এই ঘটনাকে খামোকা এত গুরুত্ব দিচ্ছি কেন! আমি যেমন আছি তেমন থাকব। আমার তো ওর ওপর কোনও দুর্বলতা নেই। তা ছাড়া, অতীন তো আবার সুস্থ হয়ে গিয়েছে। ভালো থাক এই যথেষ্ট।

সুর্মাদের এই বাড়িটা কলকাতার আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত সংসার থেকে পৃথক নয়। স্বপ্নেন্দুর ভালো চাকরির কল্যাণে এখানে কখনও অভাব ঢোকেনি বটে কিন্তু সবকিছুই একটা গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সুর্মার মায়ের ওপরই এখন সংসারের পুরো দায়িত্ব। স্বপ্নেন্দু মাসে একবার আসেন হয়তো। ছোটবোন উর্মিকে সামলাতেই মায়ের সময় কেটে যায়। সুর্মা যেমন শান্ত, উর্মি ঠিক তার বিপরীত। বড় মেয়ে সম্পর্কে সুর্মার মায়ের দুশ্চিন্তা নেই। সারাদিন বই মুখে নিয়ে ব্যস্ত আছে। প্রথম-প্রথম বড়দের বই পড়া নিয়ে রাগারাগি করতেন সুর্মার মা। এই বয়সে এত পাকা বই পড়বে কেন? সেই ক্লাস এইটে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ করেছে বাবার প্রশ্রয়ে। প্রথম-প্রথম স্বামীর ওপর খুব রাগ হতো। মেয়েকে এত লাই দেওয়া ঠিক হচ্ছে না মনে হতো। কিন্তু এখন ধারণা পালটাচ্ছেন। সুর্মা যে আর পাঁচটা ফাজিল মেয়ের মতো নয় উপলব্ধি করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এটা খুব বড় রকমের শান্তি।

আজ রবিবার। দুপুরে খেয়েদেয়ে মায়ের পাশে শুয়ে পড়েছিল সুর্মা। উর্মিকে জোর করে ঘুম পাড়াতে হয়েছিল কিন্তু সুর্মা কখন নিজেই ঘুমিয়ে কাদা। কদিন থেকে মেয়েটা বলছিল চোখ ব্যথা করে। ভাবছিলেন এবার একজন চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন। দিনরাত বই মুখ করে বসে থাকলে চোখের আর কী দোষ।

বিকেলে মেমের ডাকে ঘুম ভাঙল। দুই মেয়ে তখনও ঘুমিয়ে। ঠেলা দিয়ে সুর্মাকে তুললেন তিনি, 'সন্ধে হয়ে আসছে ওঠ।'

আলস্যে শরীর বেঁকাল সুর্মা, 'উম্‌ম। আর-একটু ঘুমুই।'

'না, আর আলসেমি করতে হবে না। উঠে পড়।'

বাধ্য হয়ে সুর্মা উঠল। উঠে বারান্দায় মোড়ায় বসে মেঘ দেখতে লাগল। হাতের কাজ সারতে তাড়া দিলেন সুর্মার মা, 'এই তুই এখনও বসে আছিস। যা চুল বাঁধ, জামা ছাড়।'

সুর্মা বলল, 'দ্যাখো মা, মেঘগুলো কী ভীষণ রাগী।'

সুর্মার মায়ের কপালে ভাঁজ পড়ল, 'তোর চোখ নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে। কালই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে দেখছি। নইলে মেঘের রাগ দেখতে পাস।'

সুর্মা বলল, 'চোখ থাকলে সব দেখা যায়। দুই চোখের মধ্যে আর-একটা চোখ।'

সুর্মার মা বললেন, 'দরকার নেই আমার তৃতীয় নয়নের। তুমি আর তোমার বাবা নেই নয়নেই দেখো। এখন দয়া করে ওঠ।'

চুলটুল বেঁধে হঠাৎ খুব সাজতে ইচ্ছে করল সুর্মার। এরকম মেঘের বিকেলে মন ভীষণ ভালো হয়ে যায় ওর। রাঁচি থেকে কেনা জিনসের প্যান্ট আর শার্টটা পরে ফেলল ও। সচরাচর প্যান্ট পরে না সুর্মা। স্বপ্নেন্দু রাঁচিতে কিনে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'বাইরে বেড়াতে গেলে এটা পরবি। আজকাল তো সব মেয়েই প্যান্ট পরে। তা পাহাড়ে ওঠা-নামা করতে সুবিধে হবে বেশ। প্যান্ট পরলে তোকে বেশ স্মার্ট দেখাবে।'

মজা লেগেছিল সুর্মার। কদিনের আড়ষ্টতা ঘুচেছিল। নিজেকে ঠিক ছেলে-ছেলে লাগে প্যান্ট পরলে। শুধু হিপের ওপর লাগানো কোম্পানির ধাতব লেবেলটি খুলে ফেলেছিল প্যান্ট থেকে। অন্যের বিজ্ঞাপন অকারণে শরীরে বইবে কেন? সুর্মার মা-ও প্যান্ট দেখে মজা পেয়েছিলেন। ভাবখানা এরকম, আর তো পরতে পারবে না, এইবেলা পরে নিক।

তা শার্ট-প্যান্ট পরে চুল আঁচড়ে ঘরে আসতেই উর্মি বলল, 'এই দিদি তুই কোথায় যাচ্ছিস রে?'

'কেন?'

'এত সেজেছিস, তোকে দেখে সবাই হাঁ হয়ে যাবে।'

'মারব এক থাপ্পড়।' কপট রাগে হাত তুলল সুর্মা। সঙ্গে-সঙ্গে উর্মি চেঁচাল, 'মা দ্যাখো, দিদি আমাকে মারছে।'

উর্মির মুখের দিকে তাকিয়ে সুর্মা হেসে ফেলল, 'তুই বড় হলে বিরাট ক্রিমিনাল হবি। এখন থেকে যা মিথ্যে বলিস!'

পড়ার টেবিলে এসে সুর্মার মনে পড়ল আজ স্বপ্না আসেনি। অথচ স্বপ্নাকে পইপই করে সে বলে দিয়েছিল ডায়েরিটা ফেরত দিতে। আগামী কালই একটা টেস্ট আছে। সেটার জন্যে ডায়েরিটা দরকার। সমস্ত ক্লাস-নোট রয়েছে ওটাতে।

সুর্মা চেঁচিয়ে বলল, 'মা, উর্মিকে স্বপ্নাদের বাড়িতে পাঠাবে?'

সুর্মার মা বললেন, 'কেন?'

'আমার ডায়েরিটা ফেরত আনতে। ও দিয়ে যায়নি।'

ওপাশ থেকে উর্মি চেঁচাল, 'আমি যেতে পারব না। ওদের একতলায় বিরাট কুকুর এসেছে। ভয় লাগে।'

সুর্মা বলল, 'ফের মিথ্যে কথা!'

উর্মি মাথা ঝাঁকাল, 'মিথ্যে তো মিথ্যে। তোর দরকার তুই যা না।'

সুর্মা অনুযোগ করল, 'শুনলে মা, ও কীভাবে কথা বলছে!'

সুর্মার মা ঘরে এলেন, 'থাক ওর গিয়ে দরকার নেই, বৃষ্টি আসছে। সুযোগ পেলেই ভিজে এসে জ্বর বাধাবে। তার চেয়ে তুই যা, সন্ধের আগেই ঘুরে আয়।'

সুর্মার বাড়ি থেকে বের হতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। এখনও শরীর থেকে আলসেমিটা যায়নি। আর-একটু ঘুমোতে পারলে বেশ হতো। তা ছাড়া, এই শার্ট-প্যান্ট পরে পাড়ার চেনা লোকদের সামনে হাঁটতে একদম ইচ্ছে করছিল না। কেউ যদি কিছু

বলে সেটা খুব লজ্জার হবে। আবার এগুলোকে ছাড়তেও আলিস্যি লাগছিল। এছাড়া আর-একটা লজ্জা লুকিয়ে আছে। সবাই তো এখন তার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে। কেউ কি বিশ্বাস করবে অতীনের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক কখনও ছিল না? ভীষণ রাগ হচ্ছিল ওর অতীনের ওপর।

কিন্তু তারপরেই ও মত বদলাল। সে যত ঘরের মধ্যে বসে থাকবে তত তো লোকে সন্দেহটাকে সত্যি ভাববে। তা ছাড়া, তাকে কলেজে যেতে হবেই যখন, তখন লজ্জা করে কী লাভ! বরং সবাইকে দেখিয়ে দেওয়াই ভালো এসব সে গ্রাহ্য করে না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে মুখের ওপর বলে দেবে ওসব নোংরা ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। সুর্মা ঘর থেকে বেরিয়ে এল, 'মা, আমি স্বপ্নাদের বাড়িতে যাচ্ছি।'

'তাড়াতাড়ি আসিস। আর হ্যাঁ, বৃষ্টি আসতে পারে, তুই ছাতাটা নিয়ে যা।' সুর্মার মা ছাতা খুঁজতে লাগলেন।

সুর্মা বাধা দিল, 'দূর, এখান থেকে এটুকু, ছাতা নেব না।'

বলে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে তরতর করে নেমে এল। বড়রাস্তা দিয়ে মিনিট তিনেক গেলেই স্বপ্নাদের বাড়ি। দোতলার ফ্ল্যাটে ওরা থাকে। মেঘের জন্যেই আকাশ বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছিল। রাস্তায় লোকজন কম। এক-আধজন ছাড়া চেনা লোক চোখে পড়ছিল না। চারধারে একটা পালানো-পালানো ভাব দেখে মজা লাগছিল ওর। এখন অন্তত কলকাতার এই পাড়ার কেউ কারও দিকে নজর দিচ্ছে না।

স্বপ্নাদের একতলার দরজায় বিকেল বেলায় কিছু মেয়ে ভিড় করে থাকে। ওরা বোধহয় পেছন দিকের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। মিছিল দেখতে বা বাজনা শুনতে যেমন ওখানে ছুটে আসে তেমনি মেঘ জমতে দেখাও বুঝি একটা কাজ ওদের। সুর্মা কোনওদিকে না তাকিয়ে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতেই একটা বিস্মিত কণ্ঠ কানে এল, কেউ কাউকে সচেতন করিয়ে দিচ্ছে, 'এই!' আর একটি মেয়ে শব্দ করে হেসে উঠল। কিন্তু সুর্মা কিছুই পরোয়া করে না এমন ভাব দেখিয়ে উঠে এল।

স্বপ্নাই দরজা খুলল। ওকে দেখে ও একেবারে হতভম্ব, 'ওমা তুই প্যান্ট পরেছিস! ইস, কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে। রাঁচিতে গিয়ে বানিয়েছিস না?'

সুর্মা ভেতরে ঢুকে এমন ভঙ্গিতে হাসল যেন প্যান্টটা কোনও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়ই নয়। কিন্তু ও স্বপ্নার চোখের লোভ পড়তে পারল। স্বপ্না এখন চাইবে দ্রুত একটা ভালো প্যান্ট হোক। সুর্মা বলল, 'তুই গেলি না যে বড়! ডায়েরিটা দে।'

ওরা কিছুক্ষণ গল্প করার পর স্বপ্নার মা এলেন, 'বাবা কিনে দিল বুঝি।'

সুর্মা বুঝতে পারেনি, 'কী মাসিমা?'

'ওই পোশাক!'

'হ্যাঁ। রাঁচিতে গিয়ে বললেন এটা পরলে পাহাড়ে ওঠার সুবিধে হয়।'

'তা কলকাতাতেও বুঝি পাহাড় বয়ে নিয়ে এসেছিস। কী যে সব রুচি হচ্ছে।' স্বপ্নার মা উদাস মুখে তাকালেন।

সুর্মার খুব লজ্জা করছিল। ঠিক এইরকম আঘাত দিয়ে স্বপ্নার মা কখনও কথা বলেন না। ও বলল, 'স্বপ্না, আমি চলি।'

স্বপ্না ঘাড় কাত করল। ওই মুহূর্তে ওকে কেমন দুঃখী-দুঃখী দেখাচ্ছিল। দরজার কাছে পৌঁছতেই স্বপ্নার মা বললেন, 'হ্যারে অতীন আজ তোদের বাড়িতে গিয়েছিল?'

সুর্মার মুখে রক্ত জমল। সে কোনওরকমে ঘাড় নাড়ল, 'না তো।'

'কী যে করিস তোরা! স্বপ্না অবশ্য বলছিল তুই ইনভলভড নস। কিন্তু পাড়ার লোকে সেকথা বিশ্বাস করবে কেন? এক হাতে তো আর তালি বাজে না। তা একটু সাবধানে যাস, পাগলটা নাকি প্রায়ই ঘোরাফেরা করে। আমার তো বাবা পাগল দেখলেই বুক হিম হয়ে যায়।' স্বপ্নার মায়ের কথা শেষ হওয়া মাত্র সুর্মা দরজা ডিঙিয়ে গেল। উঃ মানুষ কী দ্রুত পালটে যায়। সে ঠিক করল আর কখনও স্বপ্নাদের বাড়িতে আসবে না। চোখে জল এসে গিয়েছিল সুর্মার। দ্রুত মুছে নিয়ে নিজেকে শক্ত করল। না, কে কী বলল তাই নিয়ে কষ্ট পাওয়ার কোনও মানে হয় না।

দরজায় সেই মেয়েরা তখনও দাঁড়িয়ে। তাদের একটুও পাত্তা না দিয়ে সুর্মা রাস্তায় নামল। ডায়েরিটা বাঁ হাতে নিয়ে ফুটপাত দিয়ে একটু এগোতেই চমকে উঠল। সুর্মার সমস্ত শরীরে কাঁপন এল। ও কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। মুহূর্তেই অসাড়তা কেটে গেলে সে অন্য ফুটপাতের দিকে তাকাল। না, কোনওভাবেই পাশ কাটানোর উপায় নেই! পরক্ষণেই মনে হল আশপাশের বাড়ির লোক জানলা দিয়ে তাকে দেখছে কি না! স্বপ্নাদের বাড়ির সদর দরজা এখান থেকে দেখা যায় না এটুকু বাঁচোয়া। সে ঠিক করল পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।

অতীনের এক হাতে কিট্‌স ব্যাগ, অন্য হাত মুঠো করা, মাথা নিচু করে আসছিল। মুখোমুখি হতেই যেন দুচোখ জ্বলে উঠল ওর, 'আরে তুই? কবে এলি?

উত্তর দেবে কি দেবে না বুঝতেই ঠোঁট থেকে শব্দ বের হল, 'আজ।' তারপরেই পা বাড়াল সুর্মা।

'দাঁড়া, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

'না, কোনও কথা নেই।'

'আছে কি না আছে সে আমি বুঝব। রাঁচিতে পাত্র জুটল না?'

'আমার পথ ছাড়।'

হঠাৎ অতীনের গলার স্বর পালটে গেল, 'তুই এমন কেন রে?'

সুর্মার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। ওর মনে হচ্ছিল অতীন বোধহয় এখনও পুরোপুরি সুস্থ নয়। ওর কথাগুলো কেমন যেন নিঃশ্বাস জড়ানো।

'আমি যাই।'

'যাবিই তো। আমার জন্যে তুই থাকবি কেন?' অতীনের কণ্ঠস্বর ক্রমশ উঁচু পর্দায় উঠল। সুর্মা দেখল ওর চোখের আলো নিভে গেছে। কেমন ঠান্ডা স্যাঁৎসেতে ভাব সেখানে। যদি এখনই আচমকা চিৎকার করে ওঠে, যদি পাগল হয়ে যায় ফের। সে যদি দৌড়ে বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে কি অতীনও পেছনে দৌড়াবে? ঠিক সেই সময় রাস্তার ওপাশের বাড়িটার জানলা খুলে গেল। একটা বউ হাঁ করে তাদের দেখতে লাগল সেখানে দাঁড়িয়ে।

অতীন বলল, 'যাক আমি চলে যাচ্ছি আজকে।'

'কোথায়?'

'দার্জিলিং-এ। ওখানে আমার এক নেপালি বন্ধু চাকরি দেবে বলেছে। আর তোকে কখনও বিরক্ত করব না আমি। শুধু যাওয়ার আগে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

'বাড়িতে চল।'

'না ওসব কথা বাড়িতে বসে বলা যায় না।'

'কী কথা?'

'আমি কেন পাগল হয়েছিলাম।'

'আমি তার কী জানি!'

'তোর জন্যে। শুধু তোর জন্যে। আমার বেশি সময় নেই, তুই আমার কথা শুনবি কি না বল!' কথা শেষ করতে না করতেই হাত তুলে একটা ট্যাক্সিকে থামাল অতীন। তারপর দরজা খুলে ডাকল, 'উঠে পড়, যেতে-যেতে কথা বলব।'

'আমি কোথায় যাব?'

'স্টেশনে। আমাকে তুলে দিয়ে ফিরে আসবি। নইলে তোকে আর কোনওদিন আমার বলা হবে না। আয় তোর পায়ে পড়ি, আয়।' ভিক্ষে চাওয়ার গলায় বলল অতীন।

'বাড়িতে রাগ করবে। আমি যেতে পারব না।'

'আধঘণ্টার জন্যে, কেউ টের পাবে না! আয় সুর্মি!'

সুর্মা মুখ তুলতেই দেখতে পেল দূরে পাঁচ-ছয়জন ছেলে আসছে! ওরা যদি এই দৃশ্য দেখে তাহলে আর দেখতে হবে না। ওর হঠাৎ মনে হল যদি আধঘণ্টা ওর সঙ্গে থেকে ও শান্ত হয় তাহলে একটা ঝামেলা থেকে বাঁচা যায়। সে তো কোনও বিরাট অন্যায় করছে না। আর এই সময়ে টুপটুপ করে বৃষ্টি ঝরতে শুরু করল। যারা রাস্তায় ছিল তারা ছুটোছুটি করে মাথায় ছাদ খুঁজতে লাগল। প্রায় চিৎকার করে উঠল অতীন। 'আয় ভিজে যাবি!'

বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যেই কিংবা দায় এড়ানোর ভঙ্গিতে সুর্মা ট্যাক্সিতে উঠল। অতীন দরজা বন্ধ করে বলল, 'শেয়ালদা স্টেশন!'

ট্যাক্সিতে উঠেই সুর্মার মনে হল, এ কী করল সে! কেন সে আচমকা উঠে পড়ল। এখন যদি পাড়ার কেউ দেখে তাহলে হাজার বললেও বিশ্বাস করবে না। মায়ের কানে গেলে তো আর আস্ত রাখবে না। সে আসতে চায়নি এ কী কাউকে বোঝানো যাবে? গাড়িটা ততক্ষণে ট্রাম লাইনের ধার ঘেঁসে ছুটছে। সুর্মা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে জানলা ঘেঁসে বসল। বাইরে তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। সাদা দেখাচ্ছে চারধার। ট্যাক্সির ছাদে চটর-পটর শব্দ হচ্ছে।

একটু বাদে সুর্মা মুখ ঘোরাল। ওপাশের জানালার গায়ে প্রায় নেতিয়ে শুয়ে আছে অতীন। এই কদিনেই কী ভীষণ রোগা হয়ে গেছে, মুখে দাড়ি থাকা সত্ত্বেও শীর্ণ-ভাবটা চোখে পড়ছে। চুলগুলো উস্কোখুস্কো, একদৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে আছে। ওদের বাড়ি থেকে ট্যাক্সিতে শিয়ালদায় পৌঁছতে মিনিট দশেক লাগে। এই সময়ের মধ্যে অতীন কী বলবে বলে নিতে পারে। কিন্তু ওর তো কোনও ব্যস্ততা দেখতে পাচ্ছি না ট্যাক্সিতে ওঠার পর। সুর্মা জিগ্যেস করল, 'কী বলবি বলছিলি?'

অতীন ঘোলাচোখে তাকাল। ওর চোখের পাতা কাঁপতে লাগল। তারপর সুর্মাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল দুহাতে মুখ ঢেকে। কান্নার বেগটা এমন

ঢেউ-এর মতো আসছে যে মনে হচ্ছিল মোচার খোলার মতো ভাসছে ও। সুর্মা এত নার্ভাস হয়ে পড়ল যে কী করবে বুঝতে পারছিল না। ওর প্রথমে মনে হল অতীন কি আবার পাগল হয়ে গেল? পাগলরা কি এমন আকস্মিক কাঁদে! কিন্তু এরকম কান্না খুব গভীর দুঃখ না পেলে বুক থেকে উঠে আসে না। এই সময় ট্যাক্সিওয়ালা মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ক্যা হুয়া?'

অতীনের পক্ষে জবাব দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, বিব্রত মুখে সুর্মা বলল, 'কিছু না।' লোকটা কী বুঝল কে জানে, আবার গাড়ি চালাতে শুরু করল। অতীন-এর অবস্থা এমন যে সুর্মার ভয় হল ও বোধহয় ট্যাক্সি থেকে নামতেই পারবে না। ক্রমশ ছেলেটার ওপর ভীষণ মায়া হল সুর্মার। শৈশব থেকে ওকে কখনই এমন করে কাঁদতে দেখেনি। একবার দোতলা থেকে পড়ে গিয়ে পায়ের হাড় ভেঙেছিল অতীন, তখন বছর সাতেক বয়স বোধ হয়, তখনও তো এমন করে কাঁদতে দেখেনি সুর্মা। সে একটু সরে বসে অতীনের বাহুতে হাত রাখল, 'এই কাঁদছিস কেন?'

অতীন জবাব দিল না। ও যেন একটা কান্নার নেশায় আচ্ছন্ন সুর্মা আবার ডাকল, 'এই অতীন, প্লিজ কাঁদিস না। আমাকে কী বলবি বলেছিলি বল।'

একটু-একটু করে নিজেকে সামলাল অতীন, কিন্তু ততক্ষণে স্টেশন এসে গিয়েছে। চোখের জল মুছে সোজা হয়ে বসল যখন তখন ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল। সুর্মা দেখল অতীন পকেট থেকে এক গোছা টাকা বের করে ভাড়া মেটাল। অত টাকা সুর্মা একসঙ্গে কখনও হাতে নেয়নি। ওদের বাড়িতে ছোটদের হাতে টাকা দেওয়ার নিয়ম নেই। অতীনের কাছে অত টাকা এল কী করে?

দরজা খুলে অতীন ওকে ইঙ্গিতে নামতে বলে স্টেশনের ওপরের ঘড়ির দিকে তাকাল। ওর গলার স্বরে তখনও কাঁপুনি। ভিজে-ভিজে, 'এখনও আধঘণ্টা আছে, তুই আমার সঙ্গে প্লাটফর্মে চল।'

সুর্মা বলল, 'না। আমি বাড়ি যাব।'

'এই বৃষ্টি না থামলে যাবি কী করে? মিনিট পনেরো অপেক্ষা করে না হয় চলে যাস।' অতীনের গায়ে বৃষ্টির জল পড়ছে। বাধ্য হয়ে সুর্মা ট্যাক্সি থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে স্টেশনের ভেতরে ঢুকে পড়ল। চারধারে মানুষরা বৃষ্টির জন্যে আটকে থাকায় গমগম শব্দ হচ্ছে। ওদের ভিজে যাওয়া চেহারার দিকে অনেকেই তাকিয়েছিল। সুর্মা আড়ষ্ট হল। এই ভিড়ের মাঝে পাড়ার কেউ নেই তো! থাকলে আর মুখ দেখাতে হবে না! হঠাৎ ওর খেয়াল হল পকেটে একটা পয়সাও নেই। ফিরে যাওয়ার সময় বাসে টিকিট কাটতে হবে! এতদূরে সে কখনও একা আসেনি। কিন্তু চেনা বাস তো এ পাড়াতে আসে। অতীনের কাছে চাইবে নাকি! না চেয়ে কোনও উপায় অবশ্য নেই। সে হঠাৎ আবিষ্কার করল একা দাঁড়িয়ে আছে। রাত্রের আলোগুলো জ্বলছে এবং অতীন নেই! নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছিল ওর। চারপাশে তাকিয়ে অতীনকে দেখতে পেল না। এইভাবে তাকে ফেলে কি অতীন চলে যাবে? তাহলে নিয়ে এল কেন? সুর্মা কী করবে বুঝতে পারছিল না। মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকার পর যখন দূরে অতীনকে দেখতে পেয়ে প্রায় দৌড়ে গেল ও, 'কোথায় গিয়েছিলি না বলে?'

অতীনের যেন কোনও বোধশক্তি নেই এমন ভঙ্গিতে বলল, 'চল।'

'কিন্তু আমার কাছে বাড়ি ফেরার পয়সা নেই।'

'দিয়ে দেব।'

প্ল্যাটফর্মের বাইরে দাঁড়িয়ে ট্রেনটা ভিজছে। বৃষ্টির জন্যে কি না কে জানে যাত্রীরা এখনও অল্প। একটা বেঞ্চিতে ব্যাগ রেখে অতীন বসল। সুর্মা সামনে দাঁড়িয়ে ট্রেনটাকে দেখে জিগ্যেস করল, 'সত্যি চলে যাচ্ছিস?'

মাথা নাড়ল অতীন। 'হ্যাঁ।'

'চাকরি করবি?'

'হুঁঃ।'

'যদি না পাস?'

'পাবই। সুনীল আমাকে কথা দিয়েছে।'

'বাড়িতে জানে?'

'না।'

'তাহলে টাকা পেলি কোথায়?'

'পেয়েছি।'

'সত্যি বলতো কেন যাচ্ছিস?'

'তুই কি বুঝিস না? আমি যে তোকে ভালোবাসি তুই জানিস না?'

'কিন্তু আমি তো তোকে—। বিশ্বাস কর—। এরকম পাগলামি।'

'ও। এখন তো তুই আমাকে পাগল বলবি। জানি আমি তোর যোগ্য নই। আমার চেয়ে অনেক ভালো ছেলে পাবি। ও ভগবান!'

'অতীন। এরকম করে বলিস না। তোর সঙ্গে আমার কোনওদিন কিছু হয়নি।'

'কে বললে কিছু হয়নি? আমি তো তোকে ভালোবেসে এসেছি। প্রতিদিন তোর কথা ছাড়া অন্য চিন্তা করতাম না। আমি জানি তুই আমার চেয়ে অনেক মূল্যবান। কিন্তু আমি যে তোকে ভালোবাসি, কী করব বল? না, ওখানে আমি যাব না। তোকে আমি পাব না এটা আমি ওখানে বসে ভাবতে পারি না। সুর্মি, তুই আমাকে একটু ভালোবাস।'

সুর্মা কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না। হঠাৎ অতীন ওর দুটো হাত আঁকড়ে ধরল, 'তুই আমার সঙ্গে চল সুর্মি। আমি চাকরি করব, বিয়ে করে আমরা খুব সুখে থাকব। আমি বেঁচে যাব সুর্মি।'

সুর্মা দ্রুত মাথা নেড়ে চিৎকার করে উঠল, 'না, সে হয় না, না!' ওরা এতক্ষণ লক্ষ করেনি দু-একজন করে মানুষ জমছিল কাছাকাছি। সুর্মা চিৎকার করে উঠতেই একজন এগিয়ে এল, 'কী হয়েছে?'

সুর্মা ততক্ষণে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে। লোকটি আবার কড়া গলায় বলল, 'কী ব্যাপার? তখন থেকে দেখছি একটা গোলমাল হয়েছে মনে হচ্ছে।'

সুর্মা কী বলবে বুঝতে পারছিল না। ওর সমস্ত শরীর হিম। অতীন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কিছুই হয়নি। আপনার কী দরকার?'

লোকটি শক্ত চোখে ওর দিকে তাকাল, 'আপনাদের আমার সঙ্গে আসতে

হবে।'

'কেন, কোথায়?' অতীনের গলা কাঁপছিল না।

লোকটা পকেট থেকে কার্ড বের করে দেখাল। এই সময় আর-একটি মোটা মতন বয়স্ক লোক কাছে এলেন, 'কী হয়েছে শ্যাম?'

'এদের মধ্যে একটা গোলমাল আছে স্যার!' লোকটি জানাল।

আশেপাশে তখন বেশ ভিড় জমে গেছে। সুর্মার মনে হল সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। এরা নিশ্চয়ই পুলিশের লোক। ওদের যদি অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় তা হলে আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না। পাড়ার লোক দূরের কথা, মা-বাবাকেই মুখ দেখাতে পারবে না সে। মোটা লোকটি ওদের সামনে এসে দাঁড়াল, 'কী নাম?'

'আমি অতীন সেন আর ও সুর্মা।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'শিলিগুড়িতে।'

'কেন?'

'মাসিমার বাড়িতে।'

'এখানে কোথায় থাকো?'

'বাহান্নর এ বাই টু চক্রবেড়িয়া।'

'ও কে হয় তোমার?'

একটুও ইতস্তত না করে অতীন বলল, 'আমার বোন।'

'কীরকম বোন?'

'নিজের।'

লোকটা সুর্মার দিকে ঘুরে বলল, 'ও সত্যি কথা বলছে?'

সুর্মা সম্মোহিতের মতো মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'মাসিমার বাড়িতে একা-একা যাচ্ছ কেন?'

'মাসতুতো বোনের বিয়ে তাই। বাবা-মা দুদিন পরে আসবেন।' অতীন জবাব দিল। প্রথম লোকটা এবার জিগ্যেস করল, 'তাহলে তখন তুমি চেঁচাচ্ছিলে কেন?' প্রশ্নটা সুর্মাকে উদ্দেশ্য করে।

'ও একা যেতে চাইছিল না তাই!' অতীন বলে উঠল। মোটা লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'একা কেন? তুমি তো আছ?'

অতীন বেমালুম বলল, 'আমাদের তো রিজার্ভেশন নেই। তাই আমি ওকে বললাম তুই জেনারেল কম্পার্টমেন্টে উঠতে পারবি না, যা ভিড়! বরং লেডিজ কম্পার্টমেন্টে গিয়ে বোস। সঙ্গে-সঙ্গে ও চিৎকার করতে লাগল একা-একা সারা রাত্রি যেতে পারবে না।'

সুর্মা এরকম অবাক কখনও হয়নি। অতীন এত চমৎকার মিথ্যে অনায়াসে বলতে পারে! ওর মনে হচ্ছিল এই মিথ্যেটা লোকগুলো বিশ্বাস করুক তাহলে আর হাঙ্গামা হবে না। এখন কোনওরকমে বাড়ি ফিরে যেতে পারলেই সে বাঁচে। মোটা লোকটা ঘাড় বেঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তাই নাকি?'

সুর্মা নীরবে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

এই সময় ট্রেনটা হুইসল দিয়ে উঠল। অতীন ব্যস্ত চোখে সেদিকে তাকাতে মোটা লোকটা সঙ্গীকে বলল, 'না হে মনে হচ্ছে ডালমে কোই কালা নেহি, তুমি এক কাজ করো, থ্রিটায়ারের টি টি-কে আমার নাম করে বলো ওদের একসঙ্গে জায়গা করে দিতে! এই সময় ট্রেনটা ঘনঘন নিঃশ্বাস ছাড়ছিল! যাত্রীরা যে যার কামরায় ওঠার জন্যে ব্যস্ত। প্রথম লোকটি ওদের তাড়া দিল, 'চলো, এক্ষুনি গাড়ি ছাড়বে' প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে এল লোকটা থ্রিটায়ারের কাছে। দরজায় দাঁড়ানো টি টি-কে উদ্দেশ্য করে বলল, 'স্যার আপনাকে এদের দুটো জায়গা দিতে বলেছেন।' টি টি ঘাড় কাত করতেই অতীন লাফিয়ে উঠে পড়ল। লোকটি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো সুর্মাকে তাড়া দিল, 'ওঠ, ওঠ, এক্ষুনি ছেড়ে দেবে গাড়ি।'

সুর্মা চিৎকার করে বলতে গেল আমি যাব না, আমার যাওয়ার কোনও কথা নেই। কিন্তু সেই মুহূর্তে ট্রেনটা দুলে উঠল। লোকটা তাকে যেন সাহায্য করার জন্যেই পেছন থেকে ঠেলে দিল আর অতীন তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে তুলল গাড়িতে। স্থির হয়ে দাঁড়াবার মুহূর্তে সুর্মা বুঝল প্ল্যাটফর্মের আলো ছাড়িয়ে ঘন অন্ধকারে ট্রেনটা ঢুকে পড়েছে। হঠাৎ তার মনে হল সে অন্ধ হয়ে গিয়েছে, কিছুই চোখে পড়ছে না। তারপর অনুভব করল অতীনের হাতে তার হাত। সে ক্রমশ অতীনের মুখ দেখতে পেল। কী শান্ত এবং আনন্দিত। চলন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে সুর্মা বাইরে মুখ ফেরাল। কলকাতায় বাড়িঘরের আলো দূরে-দূরে ছিটকে যাচ্ছে। আর তক্ষুনি বাবা, মা এবং উর্মির মুখ একসঙ্গে মনে পড়তেই সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। অতীন চাপা গলায় অনুনয় করছিল, 'কাঁদিস না, লোকে সন্দেহ করবে।'

টি টি ভেতরে চলে গিয়েছিল। করিডোরে কেউ নেই। সুর্মা পাগলের মতো কাঁদছিল। তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। কাঁদতে-কাঁদতে ও হাঁটু গেড়ে নিচে বসে পড়ল।

আমি কী করব বুঝতে পারছি না। আমার এত আনন্দ হচ্ছে, জীবনে এরকম কখনও হয়নি। ভগবান সুর্মিকে পাইয়ে দিলেন কী অদ্ভুতভাবে। অন্তত আজকের রাতটার জন্যে তো বটেই। এবং আজকের রাত হলে আমি চিরজীবন ওকে ছাড়ব না। অথচ আজ সকালেও আমি চিন্তা করিনি ব্যাপারটা এমনভাবে ঘটবে! ওদের বাড়িতে তো যাওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠছিল না। ওর সঙ্গে দেখা হবে তাও ভাবিনি। কিন্তু ভগবান সেটা করিয়ে দিলেন এবং এই যে ও এখন ট্রেনের মেঝেতে বসে কাঁদছে সেটাও তাঁরই ইচ্ছায়। সত্যি কথা বলতে কী আজকের আগে আমি ভগবানকে পছন্দই করতাম না!

দরজাটা নড়ছে। হাওয়া ঢুকছে হুহু করে। বৃষ্টি কমে এসেছে। আমি ধীরে-ধীরে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম, বেশ ঘরের মতো হয়ে গেল। সুর্মি এখনও কাঁদছে। অন্য সময় হলে এবং জায়গাটা নিরিবিলি হলে ওকে কাঁদতে দিতাম। শুনেছি খুব কাঁদলে মন হালকা হয়ে যায়। কিন্তু এখন, যে কেউ এসে পড়লে বিশ্রী ব্যাপার হবে। আমি ওর কাঁধে হাত রেখে ডাকলাম, 'সুর্মি, এই সুর্মি প্লিজ কাঁদিস না।'

সুর্মি আমার দিকে তাকাল। দুটো চোখ ফুলে উঠেছে, গাল জলে মাখামাখি। অদ্ভুত করুণ গলায় বলল, 'তুই আমার এ কি সর্বনাশ করলি? আমি এখন মুখ দেখাব কী করে?'

কথাটা শুনে আমার মন কেঁপে উঠল। আমি ওর সর্বনাশ করলাম? যাকে আমি নিজের চেয়েও ভালোবাসি; তার সর্বনাশ করা যায়? তবু বললাম, 'উপায় ছিল না, আমি তো তোকে নিয়ে যেতে চাইনি, পুলিশরাই তো জোর করে তোকে তুলে দিল।'

সুর্মি উঠে দাঁড়াল। এবং এতক্ষণে আমার খেয়াল হল ওর পোশাক ছেলেদের মতো। শার্ট-প্যান্ট পরতে এর আগে আমি কখনও দেখিনি। আমার অস্বস্তি হলেও বুঝতে পারলাম না এই পোশাকে ওকে চমৎকার মানিয়েছে, বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে। দাঁতে ঠোঁট চেপে সুর্মি আমাকে দেখল, তারপর বলল, 'তুই মিথ্যেবাদী!'

'তার মানে? এই কথা মিথ্যে?' আমি অবাক গলায় বললাম।

'তুই ওই লোকগুলোর কাছে কীরকম মিথ্যে বললি! ছি-ছি!'

'ও, তখন মিথ্যে না বললে এতক্ষণ থানায় পচতিস তা জানিস? বেশ, আমি তো তোর মুখ বন্ধ করে রাখিনি, তুই কেন পুলিশকে বললি না সব কথা! তাহলে তো এখন আফসোস করতে হতো না?'

সুর্মি কথাটা শোনামাত্র মুখ নামাল। ওর ঠোঁট কাঁপছে। আমার ভয় হচ্ছিল ও যেন ফের না কেঁদে ফেলে। ও যে আমাকে মিথ্যেবাদী বলল তার জন্যে রাগ হল না আমার। আমি বললাম, 'ঠিক আছে, তুই এক কাজ কর, এর পরে ট্রেন দক্ষিণেশ্বরে থামবে, সেখানে নেমে চৌত্রিশ নম্বর বাসে চেপে বাড়ি ফিরে যা।' কথাটা বলার জন্যে বললাম, আমি কিছুতেই চাইছিলাম না ও ফিরে যাক।

সুর্মির চোখ যেন চট করে প্রাণ ফিরে পেল। ও সোজা হয়ে বলল, 'দক্ষিণেশ্বর! এখন ফেরা যাবে?'

'যাবে। দোহাই তত্ক্ষণ চুপ করে থাক। 'আমি মুখ ফিরিয়ে নিজেকে গালাগাল দিতে লাগলাম মনে-মনে। কী দরকার ছিল রাস্তাটা বলে দেওয়ার। সত্যি যদি ও চলে যায়? আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। শরীর টলতে লাগল। সেই মাসখানেক আগে যেমন হয়েছিল।

আমি জানি আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। পাগল হওয়ার পর কী করেছিলাম সেকথা আমার মনে নেই। পরে শুনেছি বন্ধুদের কাছে। কিন্তু পাগল হয়েছিলাম বলেই বোধহয় কেউ চট করে আমার সামনে ও বিষয়ে আলোচনা করত না। সুর্মিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার বুকে সেদিন অদ্ভুত চাপ বোধ করেছিলাম। সুর্মিকে রাঁচিতে নিয়ে যাচ্ছে বিয়ে দেওয়ার জন্যে? ওইদিন প্রথম বুঝতে পারলাম ওকে আমি কতখানি ভালোবাসি। ইদানীং তো ওর সঙ্গে তেমন কথা হতো না। ওদের বাড়িতে সেই ছেলেবেলা থেকে যাচ্ছি, এক সময় কত খেলেছি, কিন্তু বড় হয়ে যাওয়ার পর দেখতাম ও কেমন গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। পড়াশুনায় খুব ভালো, তারপর নানান রকম বই পড়ে সারাদিন। আমার আবার বইপত্তর একদম ভালো লাগে না। ওরা যেদিন রাঁচিতে গেল সেদিন আমি কেমন ঘোরের মধ্যে কাটিয়েছিলাম। সারাক্ষণ মনে হয়েছিল

সুর্মিকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। একবার ভেবেছিলাম ওদের বাড়িতে গিয়ে সুর্মিকে ডেকে সেকথা বলি। বাড়ির কাছে দুবার গিয়েও ফিরে এসেছি। সুর্মি যদি ওর বাবাকে ওই কথা বলে দেয়! ভদ্রলোক আমাকে ঠিক পছন্দ করেন না। অবশ্য মুখে কখনও সেকথা বোঝাননি। কিন্তু আমি জানি মেয়ের স্বামী হিসেবে তিনি আমাকে স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। সুর্মির স্বামী হবে কোনও অধ্যাপক অথবা বেশ সম্পন্ন মানুষ। আমার তো সেরকম যোগ্যতা কখনও হওয়ার নয়। আমার ট্যাক্সি ডেকে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কিছুতেই তা পারলাম না। আমারই ডেকে দেওয়া ট্যাক্সিতে সুর্মিকে বিয়ে দিতে নিয়ে যাবে ওরা? অসম্ভব! দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম সুর্মি ওর মা-বাবার সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠল তারপর আমার সামনে দিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল। আমার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। আর আমার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। মনে হচ্ছিল আচমকা আমার খুব জ্বর হয়েছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। পাড়ার একটা রকে চুপচাপ বসে রইলাম। সমস্ত আকাশ জুড়ে তখন সুর্মির মুখ ছাড়া কিছু নেই। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমার পায়ের তলায় মাটি নেই, আমি শূন্যে ভাসছি।

সেই সময়টা থেকে নাকি আমার পাগলামি শুরু হয়েছিল। আমি নাকি তারপর রাস্তায়, বাড়িতে সর্বক্ষণ চিৎকার করতাম ওর নাম ধরে।

পাড়ার লোকজন এই নিয়ে হাসাহাসি করত। আমি অবশ্য টের পেতাম না কারণ কোনও বোধ আমার কাজ করত না। তারপর হাসপাতালে শুয়ে-শুয়ে একসময় সেই মাটিটা পায়ের তলায় ফিরে এল। ডাক্তার বলেছে সাময়িক ডিসব্যালেন্স। কিন্তু তারপর থেকে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করত না। সুবিধা ছিল এই যে আমাকে কেউ ঘাঁটাত না! হয়তো ভয় পেত, আবার যদি পাগল হয়ে যাই!

এখন আমার ঠিক সেইরকম হল। চোখের সামনেটা সাদা হয়ে যাচ্ছে। মাথার ভেতরে অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছে, পা টলছে। আমি দুহাত বাড়িয়ে দেওয়াল ধরতে চাইলাম। আমার কাঁধ থেকে ভারী ব্যাগটা পড়ে গেল, কিন্তু ওটাকে তোলার কথা মনে এল না। সুর্মির চিৎকার কানে এল, 'এই কী হয়েছে তোর? অমন করছিস কেন?'

কিন্তু ততক্ষণে আমার হাঁটুটা ভেঙে গেছে, আমি ট্রেনের মেঝেটায় শুয়ে পড়েছি। সুর্মি আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে বারংবার ডাকছে কিন্তু আমি সাড়া দিতে পারছি না। এই সময় অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ পেলাম। বুঝতে পারছিলাম আমার চেতনা আছে, কিন্তু আমি প্রকাশ করতে পারছি না। আমি শূন্যে ভাসছিলাম না, এবার আমার পায়ের তলায় মাটিটা নড়েনি। একটা গলা কানে এল, 'কী হয়েছে?'

সুর্মির নার্ভাস গলা শুনতে পেলাম, 'হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে গেছে।' এই সময় সুর্মিকে খুব আপন মনে হল, আন্তরিকতার সুর গলায় স্পষ্ট। একটা আঙুল আমার নাকের সামনে এল, 'না, নিশ্বাস পড়ছে। এরকম প্রায়ই হয়?'

সুর্মি বলল, 'না।'

আর-একটা গলা বলল, 'অম্বলে এরকম করে। উইন্ড চাপ দিলে সেন্স থাকে না।'

প্রথম গলা বলল, 'একটু ধরুন তো ভাই, ওকে বাঙ্কে শুইয়ে দিই। আপনি মাথায় জল বুলিয়ে হাওয়া করুন, যদি সেন্স না আসে তাহলে বর্ধমানে কিছু করা যাবে।'

সুর্মি বলল, 'ওখানে তো ডাক্তার নেই।'

'নামিয়ে দিতে পারি যদি চান। তবে মনে হয় জল দিলে সেন্স আসবে।'

ওরা আমাকে ধরাধরি করে একটা বেঞ্চির উপর শুইয়ে দিল। লোকটা, সম্ভবত টি টি বলল, 'আপনাদের লাগেজ কোথায়?'

সুর্মির গলা শুনলাম, 'এই ব্যাগটাই শুধু। জল কোথায় পাব?'

'ওই তো ওখানে। বাইরে বেসিন থেকে নিয়ে আসুন।'

আর-একজন বলল, 'এই মগটা নিয়ে যাও ভাই।' কণ্ঠটি মহিলার।

একটু পরে সুর্মির নরম ভিজে হাত কপালে অনুভব করলাম। আঃ, কী আরাম। সুর্মি খুব যত্ন করে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে জল দিয়ে। ও আমার পেছনে রয়েছে। ট্রেনটা ছুটছে হুহু করে। এক সময় সুর্মি ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই অতীন, এখন কেমন লাগছে?'

আমি ঠোঁট খুলেই বন্ধ করলাম। না, উত্তর দেব না। যে দক্ষিণেশ্বরে নেমে যাবে তার সঙ্গে কোনও কথা বলব না। ওপাশের মহিলাটি বললেন, 'এখন কথা বলো না ভাই, সেন্স আসতে দাও।' আর-একজন জিজ্ঞাসা করল, 'মৃগী নেই তো?'

সুর্মি উত্তর দিল, 'না।'

আমি কপাল, গাল, গলায় সুর্মিকে অনুভব করছিলাম। আমি এখন এই অবস্থায় যদি মরেও যাই তাহলে এক ফোঁটা দুঃখ হবে না। সুর্মি আমাকে এমন করে ভালোবাসুক। এমন সময় ট্রেনটার গতি কমে আসছিল। এতক্ষণ আমি মড়ার মতো পড়েছিলাম। ট্রেনটা যখন থামব-থামব করছিল তখন টি টি-র গলা পাওয়া গেল, 'কী, কেমন আছে, সেন্স আসেনি? তাহলে এখানে—'

আমি আর দেরি করলাম না। মাথা নেড়ে 'আঃ-আঃ' বলে উঠলাম। তাতেও শান্ত না হয়ে বললাম, 'মা মাগো!' সঙ্গে-সঙ্গে টি টি বলল, 'বাঃ, এই তো সেন্স এসে গিয়েছে। এই যে ভাই, কেমন আছ?'

আমি লক্ষ করলাম লোকটা সুর্মিকে আপনি বললেও আমাকে তুমি বলল, আমি খুব ধীরে-ধীরে চোখ খুললাম। আমার চোখের পাতা কাঁপছিল। কোনওক্রমে যেন ঘাড় নাড়লাম, ভালো। টি টি জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছিল? কী খেয়েছিলে?'

'নিমকি!' কোনওরকমে বললাম!

ব্যস। সঙ্গে-সঙ্গে সবাই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, নিমকি খেয়েই আমার অম্বল হয়েছে। যা-তা তেলে ওসব ভাজা হয়, এই আলোচনা চলল। টি টি বলল, 'এখন যেতে পারবে তো?' আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম।

টি টি বলল, 'যাক, আর কোনও চিন্তা নেই। ওকে একটু ঘুমুতে দিন।' যখন আর কেউ ধারেকাছে নেই, সুর্মির একটা হাত আমার কাঁধের ওপর তখন ওর চাপা গলা শুনতে পেলাম, 'আমি নামব!'

এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। চোখ খুললাম। সুর্মি উঠবার জন্যে সোজা হয়ে বসেছে। ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'আমাকে ফেলে চলে যাবি?' সুর্মি আমার চোখের দিকে তাকাল। একটু যেন কেঁপে উঠল। তারপর ধীরে-ধীরে ওর চোখ জলে ভরে গেল। আমি দেখলাম ও চোখ বন্ধ করে একটু-একটু করে দেওয়ালে হেলান

দিয়ে মাথাটা বেঁকিয়ে দিল। এক ফোঁটা জল টপ করে গাল বেয়ে নেমে আমার কনুইতে পড়তেই ট্রেনটা দুলে উঠে চলা শুরু করল। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পাশের গঙ্গার ওপর ট্রেনটা যখন গমগম করতে-করতে উঠে এল তখন সেই জলের ফোঁটাকে আমি অনুভূতিতে পাচ্ছিলাম না। আমি স্থির জানি সেটা কনুই বেয়ে গড়িয়ে পড়েনি।

আমি চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলাম। কাঠের বেঞ্চিতে শুতে বেশিক্ষণ ভালো লাগে না। আমার ব্যাগটাকে মাথার বালিশ হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিন্তু সেটা নিজে থেকে টেনে আনি কী করে। এখন উঠে বসলে সুর্মি নিশ্চয়ই সন্দেহ করবে। ভাববে এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকার ব্যাপারটাই ভাঁওতা। একেই অনেক মিথ্যে কথা অন্যলোকের সঙ্গে বলে ওর মনে অবিশ্বাস এনে দিয়েছি। এখন এমনিভাবে কিছুক্ষণ পড়ে থাকা যাক।

ট্রেনের দুলুনিতে চোখ বন্ধ করা থাকলে ঘুম এসে যায়। আমি সত্যি বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমি শুয়ে আছি আর আমার মাথার পাশে বসে সুর্মি কাঁদছে। যদিও ওর এখনকার কান্নার কোনও শব্দ নেই কিন্তু আমি সেটা টের পাচ্ছি। আচ্ছা, ও দক্ষিনেশ্বরে নেমে গেল না কেন? আমি তো উঠিনি, বাধাও দিতাম না। লোকজন, যারা আমার দিকে তাকিয়েছিল উদ্বেগ নিয়ে তারা তো জ্ঞান হয়েছে জেনে নিজের-নিজের কথায় ফিরে গিয়েছিল। সেইসময় টুক করে উঠে পায়ে-পায়ে দরজার কাছে গিয়ে নেমে পড়লেই হতো। স্টেশন থেকে নেমে একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা বাড়ি ফিরে গিয়ে এসব কথা বলে মায়ের কাছ থেকে টাকা দিয়ে ভাড়া মেটাতে পারত। আমি কোনও কারণ বুঝতে পারছি না। আমি সত্যি কাতর গলায় বলেছিলাম, 'আমাকে ফেলে চলে যাবি,' কিন্তু সেটা শুনে ও যেন পোড়া কলাগাছ হয়ে গেল। তবে কি সুর্মিও আমাকে ভালোবাসে! আমার খুব জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু এখন উঠে কথা বললে—।

সুনীল প্রধানের সঙ্গে ভাগ্যিস বন্ধুত্ব ছিল নইলে আজ আমি ট্রেনেও উঠতাম না আর সুর্মিও আমার মাথার পাশে বসত না। সুনীল আমার সঙ্গে একবছর পড়েছিল। কার্শিয়াং-এর ছেলে, খুব হাসিখুশি, নেপালিরা শুধু বেঁটেই হয় না তা ওকে দেখে জেনেছিলাম। সুনীলের বাবার বেশ টাকাপয়সা আছে, নইলে ও ওইরকম পোশাক আর ঠাটে হোস্টেলে থাকতে পারত না। সুনীলের সঙ্গে প্রথম বন্ধুত্ব হয়েছিল দিলীপের। দিলীপ আর আমি ছেলেবেলার বন্ধু। আমি পাগল হয়ে যাওয়ার পর, ওই শুধু আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে আসার পর আমি যখন আর কলকাতায় থাকতে চাইছিলাম না, একটা চাকরি নিয়ে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা আঁটছিলাম তখন দিলীপই আমাকে সুনীলের কথা মনে করিয়ে দিল। কার্শিয়াং-এ সুনীলদের যা প্রতিপত্তি, ওখানে গেলে আমার চাকরির অভাব হবে না। সুনীলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল দিলীপ। বেশ ভাব হয়েছিল আমাদের। একবছর ওর বাবা ওকে কলকাতা থেকে সরিয়ে দার্জিলিং-এ নিয়ে গেছে। ওখানকার কলেজে পড়ে ওর বাবার ব্যবসায় সাহায্য করবে। সুনীলকে চিঠি দিয়েছি আমি সব কথা জানিয়ে। সব কথা মানে, আমি যাচ্ছি, একটা চাকরি চাই। সুর্মির জন্য কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছিলাম, সেকথা লিখিনি। আমার কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার খবর মাত্র

দুজন জানে। দিলীপ আর সুনীল। দিলীপ কাউকে বলবে না বলে কথা দিয়েছে। এমনকী আজ সকালেও স্টেশনে এসে টিকিট কিনে দিয়ে গেছে আমার জন্যে। আর সুনীলের খোঁজ কলকাতার কেউ পাবে না। এখন সুর্মি সঙ্গে থাকায় খুব হইচই হবে নিশ্চয়ই। সুর্মির বাবা পুলিশে খবর দেবেন কি? হয়তো দেবেন। কিন্তু পুলিশ খুঁজে পাবে কী করে? সুর্মি যে আমার সঙ্গে দার্জিলিং যাচ্ছে কেউ ভাবতে পারে না।

সুনীল যদি চেষ্টা করে তা হলে দিন সাতেক হোটেলে থেকে যে কোনও একটা চাকরিতে ঢুকে পড়তে পারব। আমার পকেটে এখন বারোশো টাকা আছে। এতটাকা আমি কখনও দেখিনি। বারোশো টাকায় দুজন মানুষের কতদিন যাবে? নিশ্চয়ই তার মধ্যে আমার রোজগার শুরু হয়ে যাবে। আজই সোওয়া এক ভরি হার বিক্রি করে আমি তেরোশো টাকা পেয়েছি। উফ্, বিক্রি করতে গিয়ে কী ঝামেলায় না পড়া গিয়েছিল। সোনার দোকানের লোকটা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না ওটা চুরি করা নয়। আমরা বেশ নার্ভাস ছিলাম, তাই লোকটা আমাদের ঠকিয়ে দিল। তা তেরোশো টাকা কম কীসে। দিলীপকে একশো টাকা দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু দিলীপ নেয়নি। বলেছিল, 'তোর এখন খুব দরকার হবে টাকার, তুই রাখ।' দিলীপের কথাই ফলে গেল। সুর্মি সঙ্গে থাকলে টাকার তো দরকার হবেই। বাড়িতে অবশ্য এখনই খুব হইচই হবে না। আমি পাগল হয়ে যাওয়ার পর দাদারা খুব লজ্জিত এবং বিরক্ত হয়েছিল আমার জন্যে। হাসপাতাল থেকে ফিরে আমি গম্ভীর হয়ে থাকলেও সেটা বুঝতে পারতাম। অতএব আমার চলে আসাতে ওদের কিছু ক্ষতি হবে না! মা তো জন্মাবধি দেখছি সব ব্যাপারেই নির্লিপ্ত, তবে সেটা থাকবে কোনও বিয়ের নেমন্তন্ন না আসা অবধি। ততদিন মা নিশ্চয়ই তার হারের খোঁজ করবে না।

ট্রেনটা এখন হু হু করে ছুটছে। আমার বেশ ঘুম-ঘুম পাচ্ছে। একবার ঘুমিয়ে পড়লে সারারাত আমার হুঁশ থাকে না। সুর্মিকে একা বসিয়ে রেখে সেটা উচিত হবে না। তাছাড়া আজ দুপুরের পর খাওয়া হয়নি। নিমকির কথাটা মিথ্যে হলেও এখন সত্যি-সত্যি খিদে পাচ্ছে। সুর্মি কী খেয়েছে জানি না, তবে আজ রাত্রে খাবে না নিশ্চয়ই। জোর করে ঘুম তাড়াবার জন্যে উঠে বসব ভাবছি ঠিক সেই সময় সুর্মি ডাকল, 'অতীন, এই অতীন!'

আমি খুব ধীরে-ধীরে চোখ খুললাম। সুর্মি একটু ঝুঁকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার চোখ স্পষ্ট হতেই বলল, 'এখন কেমন লাগছে? কষ্ট হচ্ছে?' আঃ, এর চেয়ে আনন্দ আমার আর কী হতে পারে। বুক জুড়িয়ে গেল। আমি সামান্য মাথা নেড়ে উঠে বসতে গেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে সুর্মি বাধা দিল, 'না না ওঠার দরকার নেই। তুই শুয়ে থাক।'

আমি সোজা হয়ে বসে বললাম, 'না, আমি ঠিক হয়ে গেছি। তুই চোখ মোছ সুর্মি, এখনও জলের দাগ লেগে আছে।'

অতীন উঠে বসলে ওকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। যদিও বলল ঠিক আছে কিন্তু আমার মনে হল কথাটা সত্যি নয়। ও অবশ্য একটু আগের জলের মতো মিথ্যে কথা বলেছে আর আমি অবাক হয়েছি। কিন্তু এখন তো মিথ্যে বলার দরকার ছিল না। প্রায়

দুঘণ্টা হল আমরা ট্রেনে উঠেছি। যাত্রীরা নিজের বাঙ্কে বিছানা করে রাত্রের খাওয়া শুরু করেছে। আমাদের সঙ্গে ওসব কিছুই নেই বলে সবার চোখে পড়েছি। এই সময় টি টি কাছে এসে দাঁড়াল, 'ঠিক আছ ভাই?'

অতীন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। লোকটি বলল, 'আমি মালদায় নেমে যাব। তবে তোমাদের ভয় নেই, আমি ওখান থেকে যে টি টি উঠবে তাকে বলে যাবে, মানে এই বার্থ দুটোর জন্যে বুঝলে?'

অতীন আবার ঘাড় নাড়ল। এবং সেই সময় ট্রেনটার স্পিড কমে আসতে টি টি বলল, 'বর্ধমান আসছে।' বলে চলে গেল।

অতীন উঠে দাঁড়াল। আমি এটা একদম চাইছিলাম না। ওর চোখের রং এখনও লালচে। সেটা তো মিথ্যে নয়। আর-একটু শুয়ে থাকতে পারত। কিন্তু ও ততক্ষণে এগিয়ে গেছে বেসিনের দিকে। জলে মুখ ধুয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। মুখে জল চকচক করছে। এগিয়ে এসে বলল, 'ব্যাগটা দে তো, তোয়ালে বের করব।'

পেছন থেকে ব্যাগটা বের করে এগিয়ে দিতে গিয়ে নিজেই সেটাকে খুললাম। তোয়ালেটা একদম ওপরেই ছিল। সেটা তুলে নিয়ে ওর হাতে দিলাম। মুখ মুছে পরিষ্কার হয়ে আমায় ফেরত দিতে আমি ওটাকে স্বস্থানে রেখেছিলাম। অতীন বলল, 'এর পরে কোথায় থামবে জানি না, তাই রাতের খাবার বর্ধমান থেকেই কিনে নেব। কী খাবি?'

আমার খিদে লাগছে না, খাব না। সত্যি আমার ওসব বোধ ছিল না।

'বোকার মতো কথা বলিস না। অতটা রাত সামনে, না খেলে শরীর খারাপ করবে। আমার ওপর রাগ করে নিজের শরীরটাকে কষ্ট দেবার কোনও মানে হয় না।'

'আমি কারও ওপর রাগ করিনি।'

'করেছিস।'

কী বলব আমি। মুখ ফিরিয়ে নিলাম। ভাগ্য ছাড়া আমি কার ওপর রাগ করতে পারি! এইসময় ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই যাত্রীরা দরজার দিকে ছুটল। অতীনও আর দাঁড়াল না। আমি বেঞ্চের ওপর পা তুলে ঠেস দিয়ে বসলাম। প্যাসেজের পাশের ডবল বার্থটা আমাদের দেওয়া হয়েছে। ফলে গায়ের ওপর দিয়ে লোক যাচ্ছে ঘনঘন। এই কদিন আগে বাবার সঙ্গে রাঁচিতে গিয়েছিলাম ফার্স্টক্লাসের কুপে। অফিস থেকে বাবা খরচ পান। একটা ঘরে আমরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। কী আরামেই সেই যাওয়া। তারপরেই মনে পড়ল আমার ক্লাসটেস্ট। সেই পরীক্ষা আমি দিতে পারব না। আমার জন্যে হয়তো কোনও ভালো জিনিস আর কখনও অপেক্ষা করবে না। এই সময় কানে এল মাইকে ঘোষণা করছে—ডাউন হাওড়া লোকাল দু-নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে এখনই ছাড়বে। মনের মধ্যে আনচান করে উঠল, ওই ট্রেনে গিয়ে উঠলে আজকের রাত্রেই নিশ্চয়ই কলকাতা পৌঁছে যেতে পারি। উঠে দাঁড়ালাম তড়াক করে। আর তখনি অতীন বিরাট ঠোঙা হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে বলল, 'ধর। আমি হাত ধুয়ে আসি।'

ঠোঙাটা নিয়ে আমি ধীরে-ধীরে বসলাম। জানালা দিয়ে দেখলাম ওপাশে দাঁড়ানো একটা খালি ট্রেন বিপরীত দিকে চলতে শুরু করল। শক্ত চোখে ট্রেনটার

চলে যাওয়া দেখলাম। আমি কাঁদলাম না। কী হবে কেঁদে। আমার ভাগ্যে কী হবে আমি জেনে গেছি।

হাত ধুয়ে এসে অতীন বলল, 'খুব খিদে পেয়েছে। তুই হাত ধুবি না?'

একটুও ইচ্ছে করছিল না। খাওয়ার কোনও বাসনাই নেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম উলটোদিকের বেঞ্চিতে বসে সেই মহিলা এবং অন্যান্যরা আমাদের দেখছেন। অতএব আমি উঠলাম। বেসিনে হাত ধুয়ে এসে ঠোঙা খুললাম। গরম পুরি-তরকারি আর জিলিপি এনেছে অতীন। বেশিরভাগ ওকে দিয়ে নিজের জন্যে সামান্য রাখলাম। খাওয়া শেষ হলে হাত ধোওয়ার পর অতীন বলল, 'যাঃ, জল খাব কী করে? এই জল তো খাওয়া যাবে না।'

মহিলাটি বললেন, 'তোমরা আমাদের জল নিতে পারো।' বলে একটা জলের বোতল এগিয়ে দিলেন। অতীন একটুও দ্বিধা না করে তা থেকে কয়েক ঢোক খেয়ে টেঁকুর তুলল। আমি সামান্য খেয়ে বোতলটা এগিয়ে দিতে মহিলা বললেন, 'তোমরা একদম খালি হাত হয়ে এসেছ, কী ব্যাপার?'

অতীন বলল, 'একটা বাস্কেটে ওসব ছিল। তাড়াহুড়োতে ট্যাক্সি থেকে নামবার সময় ফেলে এসেছি।'

'ওমা! পুলিশকে খবর দিয়েছ?'

'দিলে তো আর পাওয়া যেত না এখনই। সুর্মি, তুই এখনই শুয়ে পড়বি?'

আমি বুঝলাম ও কথা ঘোরাচ্ছে। অতীন এখনও কী সুন্দর মিথ্যে কথা বলল। ও যে এ ব্যাপারে এত পোক্ত তা আমি জানতাম না। বললাম, 'তুই শুয়ে পড়।'

'আমি ওপরে শুচ্ছি, তুই নিচে শো।' ব্যাগটা ওপরের বাঙ্কে রেখে অতীন তা থেকে একটা চাদর বের করে নিচের বেঞ্চিতে পেতে দিয়ে বলল, 'এই ব্যাগে মাথা রেখে শুয়ে পড়।'

আমি অবাক গলায় বললাম, 'তুই?'

ও হাসল, 'আমার দরকার হবে না। আমার আরাম আমি পেয়ে গেছি।'

বুঝলাম না কথাটা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায়?'

চাপা গলায় ও উত্তর দিল, 'এই তো আমার সামনে দাঁড়িয়ে। এখন আমার চেয়ে সুখী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। বালিশের, চাদরের তাই দরকার হবে না।'

দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আমি শুয়েছিলাম। ট্রেন হুহু করে ছুটছে। ওপরে ওঠার আগে জানলাটা বন্ধ করে দিয়েছে অতীন। ও যে আমার কোনও কষ্ট না হয় তার জন্যে সজাগ রয়েছে। ও যা বলছে তা কি ঠিক? ও কি সত্যি আমাকে এরকম ভালোবাসে? হঠাৎ আমার বুকের ভেতর কাঁপুনি এল। পাগল হয়ে অতীন রাস্তায় চিৎকার করেছিল, আই লাভ ইউ সুর্মা। পাগলরা নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলে না।

চোখ বন্ধ করতেই বাবার মুখটা ভেসে উঠল। বাবা এখন কী করছেন? মা? উর্মি? এখন রাত কত আমি জানি না! নিশ্চয় স্বপ্নাদের বাড়িতে খোঁজ নেওয়া হয়ে গেছে। বাবা এতক্ষণে পাগলের মতো চারধারে খুঁজছেন আমাকে। মা কান্নাকাটি করা ছাড়া আর কী করতে পারেন! বাবার মুখ মনে পড়তেই চাপা কান্নাটা ছিটকে এল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে রইলাম। দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরানো বলে কেউ

আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। আমাদের দুজনকে যদি কেউ ট্যাক্সিতে দেখে থাকে তাহলে বাবা নিশ্চয়ই অতীনের বাড়িতে যাবেন। বাবা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবেন না আমি অতীনের সঙ্গে এভাবে কোথাও চলে যাব! আমার এতদিনের শিক্ষা, রুচির সঙ্গে মিলিয়ে এটা কখনও হতে পারে না। আমি জানি আজ রাত্রে ওরা কেউ ঘুমুতে পারবেন না। হয়তো পুলিশে খবর দেবেন বাবা। কিন্তু অতীন যে দার্জিলিং যাচ্ছে সেটা তো কেউ জানতে পারবে না। আমি যেভাবে চলে এসেছি খালি হাতে তাতে আমার পক্ষে বেশি দূর যাওয়া তো সম্ভব নয়। আমি যেন দেখতে পেলাম বাবা বলছেন, 'সুর্মি আমাকে না বলে চলে গেল! কী দুঃখ ছিল ওর যে আমাকে একবার বললও না।'

আমি বাবাগো বলে ডুকরে উঠতে গিয়ে কোনওরকমে নিজেকে একটু সামলালাম। ঠিক করলাম যেখানে যাচ্ছি সেখানে পৌঁছেই বাবাকে একটা চিঠি লিখব। সব কথা স্পষ্ট করে লিখে বলব, 'বাবা তুমি এসো' কথাটা ভাবতে বুকের ভেতরটা একটু সহজ হল। আমি স্থির হলাম।

হঠাৎ হাতের ওপর স্পর্শ পেতে চমকে সোজা হলাম। ট্রেনের ভেতর এখন ঘুমের রাজত্ব। কোথাও মানুষের শব্দ নেই। একটানা গাড়ির চাকার ধাতব আওয়াজ ছাড়া কিছু নেই। আমার পায়ের কাছে অতীন বসে আছে। কখন নেমে এসেছে জানি না, চোখাচোখি হতেই বলল, 'সুর্মি, প্লিজ, প্লিজ, কাঁদিস না। তুই বিশ্বাস কর, তুই ছাড়া আমার কেউ নেই। তোকে আমি—।' ও আমার হাত আঁকড়ে ধরল, 'তুই আমার ওপর একটু আস্থা রাখ, দেখবি তোকে কখনও কষ্ট দেব না। সুর্মি আমাকে একটু ভালোবাসা দে, আমি আর কিছু চাই না।'

কেন জানি না, এখন এই রাত্রে যে আমি একটু আগে বাবার জন্য কাঁদছিলাম সেই আমার মনে ক্রমশ একটা মায়ার আকাশ তৈরি হয়ে গেল। আমার এই বয়স পর্যন্ত কোনও পুরুষের মুখে এমন আকুতি শুনতে পাইনি। অতীন ভিক্ষে চাওয়ার মতো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি কোনওরকমে বললাম, 'ঠিক আছে। আমি আর কাঁদব না, যা তুই শুয়ে পড়।'

সুর্মার মা স্বপ্নাদের বাড়ি থেকে নেমে এসে কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। একটু আগে স্বপ্নেন্দু ফিরেছেন। ওঁর আজ রাঁচিতে যাওয়া হয়নি। অফিসের কাজ শেষ হয়নি এখনও। একটু আগে বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি এসে সুর্মাকে না দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বৃষ্টি ধরতেও যখন এল না তখন সুর্মার মা নিজে এসে খোঁজ নিয়েছিলেন স্বপ্নাদের বাড়িতে। সুর্মা নাকি সেই বিকেলবেলায় ডায়েরি নিয়ে বেরিয়ে গেছে, বেশিক্ষণ বসেওনি।

বাড়ি গিয়ে দেখলেন সুর্মা আসেনি। বৃষ্টিতে পথে আটকে থাকলে এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত ছিল। স্বপ্নেন্দু বললেন, 'ও তো এরকম কখনও করে না। দিনকাল ভালো নয়, অ্যাক্সিডেন্ট হল কি না কে জানে।'

সুর্মার মা বললেন, 'পাড়ার মধ্যেই ছিল, সেরকম কিছু হলে জানতাম না?'

নটা বেজে গেলে অস্থির হয়ে স্বপ্নেন্দু বের হলেন। দুবার পাড়াটা পাক দিয়ে

ইয়ং বুলেটস-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন। কয়েকটি ছেলে বারান্দায় এসে আড্ডা মারছে। এদের তিনি খুবই অপছন্দ করেন। তবু মনে হল এরা দেখে থাকতে পারে সুর্মাকে। ওদের মধ্যে একটি পরিচিত মুখকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, তোমরা এখানে কতক্ষণ ধরে আছ?'

'কেন বলুন তো!'

'আমার মেয়ে সুর্মাকে তো চেনো! ও বাড়ি ফেরেনি তাই—।'

স্বপ্নেন্দুর কথাটা শেষ করতে অস্বস্তি হচ্ছিল। এখনই কথাটা হাওয়ায় ভেসে বেড়াবে।

'না তো ওকে দেখিনি। কোথায় গিয়েছিল?' ছেলেরা উৎসুক হল।

'ওর বন্ধু স্বপ্নার বাড়িতে। তা সেখান থেকে বিকেলেই বেরিয়ে পড়েছে। কোথায় যে গেল। ওর মা কান্নাকাটি করছে। আচ্ছা ভাই চলি!' স্বপ্নেন্দু পা বাড়াতেই ছেলেটা বলল, 'আমরা তো বৃষ্টির পর এসেছি। ঠিক আছে, আমরা দেখছি।'

স্বপ্নেন্দু বড় রাস্তা অবধি এসে আবার ফিরে গেলেন। মনে হল বাড়িতে ফিরে নিশ্চয়ই মেয়েকে দেখতে পাবেন। দরজায় স্ত্রী দাঁড়িয়ে, ওঁকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'পেলে?'

'বাড়িতে আসেনি?'

'না।'

'তাহলে—?' স্বপ্নেন্দুর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। আর তখনই সুর্মার মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন, 'কী হল মেয়েটার! তুমি খোঁজ নাও, আমার ভয় করছে।'

পাশের ফ্ল্যাটের লোকজন বেরিয়ে এল। মুহূর্তেই সমস্ত পাড়াময় খবরটা চাউর হয়ে গেল। সুর্মাকে পাওয়া যাচ্ছে না, বিকেলে বেরিয়ে বাড়ি ফেরেনি। এক-একজন এক-একরকম পরামর্শ দিতে লাগল। পুলিশে খবর দেওয়ার আগে একবার ওর মামির বাড়িটা দেখে আসা দরকার। কোনও অভিমান করে মেয়ে যদি সেখানে গিয়ে বসে থাকে। অবশ্য সেরকম মেয়ে সুর্মা নয়, তবু স্বপ্নেন্দু কোনও চান্স নিতে চাইলেন না। বাড়ি থেকে বের হতেই ইয়ং বুলেটস-এর ছেলেগুলোকে দেখতে গেলেন তিনি। ওরা বোধহয় তাঁর কাছেই আসছিল। পরিচিত ছেলেটি বলল, 'কাকাবাবু, একটা হদিশ পেয়েছি।'

বুকের মধ্যে ঢেউ উঠল যেন ছলাৎ করে। স্বপ্নেন্দু তাকালেন।

'বৃষ্টির জন্যে পাড়ার ফুচকাওয়ালা পালিয়ে যাচ্ছিল তাড়াতাড়ি, তখন ও দেখতে পেয়েছে সুর্মা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অতীনের সঙ্গে কথা বলছিল।'

'অতীনের সঙ্গে!' স্বপ্নেন্দু অবাক হলেন।

'হ্যাঁ। আপনি অতীনের কেসটা জানেন তো?'

'না।'

'অতীন আপনারা রাঁচি চলে যাওয়ার পর পাগল হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করত সুর্মার নাম ধরে।'

'সেকি! কেন?'

ছেলেগুলো উত্তর না দিয়ে নিজেদের মধ্যে হেসে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

'না-না, এ তোমরা ঠিক বলছ না!' স্বপ্নেন্দুর পায়ের তলার মাটি যেন টলছিল। সুর্মা এই বয়সে অতীনের মতো ছেলেকে কখনই প্রশ্রয় দেবে না। এরা সত্যি কথা বলছে না।

ছেলেটি বলল, 'সুর্মার দোষ আছে কি না জানি না, কিন্তু অতীনের ঘটনাটা সত্যি। আমাদের মনে হয় একবার অতীনের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করলে সুর্মা কোথায় আছে জানা যাবে। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন।'

স্বপ্নেন্দু কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। সুর্মার সঙ্গে অতীনের কোনও যোগ থাকতে পারে না। হয়তো পথে দেখা হয়েছে, দু-একটা কথা বলেছে আর তখন ফুচকাওয়ালা দেখে থাকতে পারে। তার মানেই সুর্মা আর অতীন কোথাও গিয়েছে এ তিনি মানতে পারেন না। ফুচকাওয়ালা অবশ্য সুর্মাকে অনেকদিন থেকেই চেনে কিন্তু তার কথাটাই...ছেলেটিকে বললেন, 'তুমি একা গিয়ে অতীনকে ডেকে আনো। দলবেঁধে যেও না, আমি এখন অপেক্ষা করছি।'

ছেলেটি একটু বাদেই একা ফিরে এল। এসে বলল, 'অতীন বাড়িতে নেই কাকাবাবু। আজ বিকেলে কোথায় চলে গেছে।'

স্বপ্নেন্দু চিন্তিত হলেন, 'অতীন বাড়িতে নেই!' তাহলে—! আর অপেক্ষা করতে পারলেন না তিনি। সোজা চলে এলেন অতীনের বাড়িতে। এদের সবাইকে তিনি চেনেন। একসময় পাশের বাড়িতে থাকতেন এঁরা।

অতীনের মা, প্রৌঢ়া এবং সাদাসিধে মহিলা, বললেন, 'সে বাড়িতে নেই।'

স্বপ্নেন্দু বললেন, 'শুনলাম। আমার মেয়েকেও পাচ্ছি না। খবর পেলাম আজ বিকেলে ওদের দেখা হয়েছিল। অতীন কোথায় গিয়েছে?'

'বলে যায়নি।'

'কখন ফিরে আসবে বলেছে?'

'না। একটা ব্যাগে জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছে।'

'কী আশ্চর্য! আপনার ছেলে কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করলেন না?'

'আজকাল আমাদের সঙ্গে কথা বলত না ও। আপনার মেয়ের জন্যেই তো এই দশা!'

'আমার মেয়ে? কী বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি! আপনার মেয়ের জন্যেই আমার ছেলে পাগল হয়ে গিয়েছিল। ওইটুকু ছেলের মনে দুঃখ দিলে ভগবান সইবেন না।' অতীনের মা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। স্বপ্নেন্দু বিরক্ত হলেন, 'আপনি কিছু না জেনে কথা বলছেন। আপনার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের কোনও সম্পর্ক ছিল না। ইদানীং কথাও বলত না ওরা। অতীন যদি মনে কিছু ভাবে তার জন্যে কেউ দায়ী নয়। কিন্তু আপনি মা হয়ে ছেলেকে একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না সে কোথায় যাচ্ছে! কোথায় যেতে পারে সে?'

'আমি জানি না। ইদানীং কেউ ওকে পছন্দ করত না। কাল রাত্রে বলছিল কোথায় গেলে চাকরি পাবে। হয়তো দুর্গাপুরে গিয়েছে।' অতীনের মা জানালেন।

'দুর্গাপুরে কে আছেন?'

'ওর কাকা।'

'ওখানে কখনও অতীন এর আগে গিয়েছে?'

'না।'

স্বপ্নেন্দু কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। এইসময় ইয়ং বুলেটস-এর একটি ছেলে বলে উঠল, 'মাসিমা, অতীন যাওয়ার সময় কী-কী জিনিস নিয়ে গেছে?'

'তেয়ালে, সোয়েটার বের করে নিল আলমারি থেকে।'

'সোয়েটার? এখন সোয়েটার নেবে কেন? দুর্গাপুরে তো প্রচণ্ড গরম! ব্যাপারটা ভালো লাগছে না। কাকাবাবু আপনি থানায় খবর দিন।' ছেলেটি বলল।

সেই রাত্রেই থানায় এলেন স্বপ্নেন্দু। এসে অবাক হলেন। ওঁর কলেজজীবনের সহপাঠী প্রণব এখন ওই থানায় পোস্টেড। এত বছর বাদেও চিনতে কোনও অসুবিধে হয়নি। স্বপ্নেন্দু সব খুলে বলার পর প্রণব ডায়েরিতে লিখে নিল। তারপর বলল, 'আমার মনে হচ্ছে তোমার মেয়েকে ছোকরাই লোপ করেছে।'

'কিন্তু কী করে করবে? ওরা তো সমবয়সি বলা যায়! পাড়া থেকে ধরে নিয়ে গেলে সে একা পারবে কেন? আর পাড়ার লোক জানবে না?' স্বপ্নেন্দু প্রতিবাদ করলেন। প্রণব হাসল, 'কিছু মনে করো না, তুমি কী করে নিশ্চিন্ত হচ্ছ যে তোমার মেয়ে ছোক-রার প্রেমে পড়েনি?'

'আমি আমার মেয়েকে চিনি।'

'তোমার মেয়ে কোনও লাগেজ নেয়নি সঙ্গে?'

'কিছু না। সত্যি কথা কী ও বাড়ি থেকে বের হতেই চায়নি।'

'এই জায়গাটায় আমার গুলিয়ে যাচ্ছে। প্ল্যান করে গেলেও সঙ্গে জামাকাপড় নিত। ছেলেটার কোনও বন্ধুবান্ধব আছে?' প্রণব জিজ্ঞাসা করল।

'আমি জানি না। তুমি যে করেই হোক মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনো ভাই।' স্বপ্নেন্দু সহপাঠীর হাত জড়িয়ে ধরলেন। প্রণব বলল, 'একটু শক্ত হও। আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হবে না। এখন চলো তো ছেলেটার সম্পর্কে খোঁজ নিই!'

পুলিশের গাড়ি করে স্বপ্নেন্দু পাড়ায় ফিরে এলেন। রাত দশটা বেজে গেছে তবু রকে-রকে ভিড়। শুধু মেয়ে নয় সঙ্গে একটি ছেলেও উধাও, এই রসময় বার্তা সবাইকে বেশ তপ্ত করেছিল। অতীনের পাগল হওয়ার পেছনে সুর্মার সক্রিয় হাত ছিল তা এতদিনে প্রমাণিত হল পাড়ার লোকের কাছে। প্রণব স্পপ্নেন্দুকে তাঁর বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে অতীনের বাড়িতে চলে গেল। স্বপ্নেন্দুর নিজের বাড়িতে ঢুকতে ভয় করছিল। সুর্মার মা এখন কী অবস্থায় আছে কে জানে! সামনের বাড়ির এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়েছিলেন সামনে, বললেন, 'আপনাদের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।'

স্বপ্নেন্দু ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আজকালকার ছেলেমেয়ে, এদের জোর করে বাধা দিলে এইরকম হয়!'

স্বপ্নেন্দু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন। তিনি কী করে এদের বোঝাবেন যে সুর্মা তেমন মেয়ে নয়। বাধা দেওয়ার কোনও কথাই ওঠেনি। এই মুহূর্তে তাঁর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল মেয়ের ওপর। এতদিন ধরে তিলে-তিলে মনের মতো করে যাকে গড়েছেন সব ভালোবাসা, রুচি দিয়ে, সে এইভাবে শাস্তি দিল?'

একটু বাদেই প্রণব ফিরে এল গাড়ি নিয়ে। নেমে জিজ্ঞাসা করল, 'দিলীপ কে?

কোথায় থাকে জানো?'

ইয়ং বুলেটস-এর একটি ছেলে বলে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, দিলীপ গাঙ্গুরামের পাশের বাড়িতে থাকে। অতীনের বন্ধু।'

দিলীপ বাড়িতেই ছিল। পুলিশ দেখে মুখ শুকিয়ে গেছে ছেলেটার। বড়জোর বছর সতেরো বয়স হবে। ওর বাড়ির লোক হতভম্ব। প্রণব তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম তো দিলীপ। অতীনের বন্ধু?'

দিলীপ কিছু বলল না। বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছিল।

'অতীন কোথায় গিয়েছে?'

'জানি না।'

'সঙ্গে কে গিয়েছে?'

'আমি কিছুই জানি না।'

'জানো না! তোমার সঙ্গে ওর কবে দেখা হয়েছিল?'

একটু ইতস্তত করে দিলীপ বলল, 'গতকাল।'

'কী কথা হয়েছিল?'

'তেমন কিছু না। ও হাসপাতাল থেকে এসে খুব কম কথা বলত।'

'কোথায় চাকরি করতে যাবে বলেনি?'

'না। বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানি না।'

'সুর্মাকে চেন?'

'চিনি। কিন্তু কখনও কথা বলিনি।'

'সুর্মার কথা অতীন তোমাকে বলত?'

'এখন বলত না।'

প্রণব খানিক ভাবল তারপর বলল, 'হুম। তুমি আমার সঙ্গে চলো।'

'কোথায়?'

'থানায়। কারণ তুমি সত্যি কথা বলছ না।' প্রণব ওর হাত ধরল।

'বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানি না।' প্রায় ককিয়ে উঠল দিলীপ।

স্বপ্নেন্দু এতক্ষণ শুনছিলেন, এবার বললেন, 'ভাই, তুমি যা জানো বলে দাও, খামোকা দেরি করলে মেয়ের বিপদ হতে পারে!'

'আমি কিছু জানি না।' দিলীপ শরীর বেঁকাচ্ছিল।

প্রণব একজন কনস্টেবল ডাকতেই দিলীপ বলে ফেলল, 'ও দার্জিলিং-এ গিয়েছে। আজকের ট্রেনে।'

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'দার্জিলিং!'

প্রণব কড়া গলায় ধমকাল, 'এতক্ষণ মিথ্যে কথা বলছিলে কেন?'

'অতীন আমাকে শপথ করিয়েছিল যেন কাউকে না বলি। বিশ্বাস করুন এর বেশি কিছু জানি না!' প্রায় কেঁদে ফেলল দিলীপ।

'দার্জিলিং-এ কার কাছে গিয়েছে?'

'আমাদের সঙ্গে পড়ত একটি নেপালি ছেলে, তার কাছে।'

'কী নাম তার?'

'সুনীল প্রধান। ওখানকার কলেজে পড়ে। কার্শিয়াং-এ থাকে।'

'দার্জিলিং না কার্শিয়াং?'

'কার্শিয়াং।'

'অতীন একা গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। আজ সকালে টিকিট একটা কিনেছে ও।'

'টাকা পেল কোথায়?'

দিলীপ আর-একবার চেষ্টা করল মিথ্যে কথা বলতে কিন্তু সে এমন ভেঙে তেরোশো টাকায় সে হারটা কিনেছে। মাঝরাত্রে স্বপ্নেন্দুকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে প্রণব বলল, 'মনে হচ্ছে মেয়েটা অতীনের সঙ্গেই গিয়েছে। আমি এখনই লালবাজারে খবর দিচ্ছি যাতে এন. জে. পি. স্টেশনে ওদের ধরে ফেলতে পারে। তুমি চিন্তা করো না কিছু।'

বাড়িতে ঢুকে স্তব্ধ হয়ে গেলেন স্বপ্নেন্দু। সুর্মার মা ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে অন্ধকার ঘরে। স্খলিত পায়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন তিনি। আলো জ্বালাতেই দেওয়ালের দিকে চোখ চলে গেল। পেছন থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরে সুর্মা ঘাড়ে মুখ রেখে হাসছে। সহজ ককককে হাসি। একটু মলিনতা নেই কোথাও। সন্ধে থেকে যা হয়নি, নিজেকে সামলে রেখেছিলেন প্রাণপণে, ওই ছবির দিকে তাকিয়ে আর পারলেন না। হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন স্বপ্নেন্দু। ওই উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে কান্না জড়ানো গলায় বলতে লাগলেন, 'এ তুই কী করলি মা, আমি যে তোকে—!'

ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে গেল। কাল অনেক রাত অবধি জেগেছিলাম। সুর্মা কথা রেখেছিল, আর কন্নাকাটি করেনি। ঘুম ভাঙতেই চেয়ে দেখলাম, ও ছোট্টটি হয়ে ঘুমুচ্ছে। ভীষণ মায়া হল দেখে। তারপরেই মনে পড়ল ওর টিকিট নেই। রাত্তিরে আমার অসুস্থতা কিংবা রেলপুলিশের অনুরোধে, যাই হোক না কেন, টি টি আমাদের কাছে টিকিট চায়নি। মালদা থেকে যে উঠেছিল তাকে আমাদের কথা বলে গিয়েছিল লোকটা। কিন্তু মেইন গেট পেরোতে গেলেই তো টিকিট দেখাতে হবে। আমি নামলাম। নতুন টি টি বসে ঢুলছিল। তার কাছে গিয়ে বললাম, 'শুনুন, আপনাকে একটা কথা বলব।'

লোকটা চোখ খুলে আমায় দেখল। তারপর বলল, 'কী কথা?'

আমি অম্লান বদনে বললাম, 'আপনার আগের টি টি আপনাকে পনেরোটা টাকা দিতে বলে গেছেন।' কথা শেষ করেই ওর হাতে টাকাটা গুঁজে দিলাম। লোকটা সেটাকে বেমালুম পকেটে ঢুকিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে বের হতে হবে। ট্রেন থামলেই নেমে পড়বে।'

একটা ফাঁড়া কাটল। বাইরে তখন আলো ফুটছে। বেশ ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব। দূরে পাহাড়ের রেখা দেখা যাচ্ছে আকাশের গায়ে। এদিকে আমি কখনও এর আগে আসিনি। ঠিক করলাম, কোনও ঝুঁকি নেব না।

সুর্মার পায়ের পাশে বসতেই ওর ঘুম ভেঙে গেল। মুখচোখ ফোলা, কপালের ওপর ভাঙা চুল, চট করে উঠে বসল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেমন লাগছে এখন?'

প্রশ্নটা করার কোনও মানে নেই, তবু কিছু বলতে হবে তো! ও আমার দিকে তাকাল। ট্রেনটাকে দেখল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কটা বাজে!' আমার হাতে ঘড়ি নেই। আন্দাজে বললাম, 'ছটা বেজে গেছে মনে হয়।'

ও উদাস চোখে কামরার ভেতরে তাকাল। ও কী ভাবছে এখন? এই সময় কলেজে যাওয়ার কথা, ওর কি তাই মনে পড়ছে? আমি উঠে জানলার খড়খড়ি তুলে দিলাম। টাটকা বাতাস এসে শরীর জুড়িয়ে দিল। দূরে পাহাড়ের আদল এখন অনেকটা স্পষ্ট। অতি দ্রুত বলে উঠলাম, 'দ্যাখ-দ্যাখ কী সুন্দর পাহাড়!'

সুর্মা মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ওর চোখে মুখে ভালোলাগা ছড়িয়ে পড়তেই আমার মন ভরে গেল। মুগ্ধ হয়ে সুর্মা উত্তর বাংলার প্রকৃতি দেখছে। উলটো দিকে সূর্য উঠছে কিন্তু তার আলো মাখছে এদিকের আকাশ। মাঠ-জঙ্গলকে দুপাশে ছুড়ে ফেলে আমাদের ট্রেনটা ছুটছে। কিছু দূরে ভিজে পিচের রাস্তায় ভারী-ভারী লরি চলেছে একের পর এক।

হঠাৎ আমার মনে হল কাল রাত থেকে একবারও আমি বাড়ির কথা ভাবিনি। মা কিংবা দাদাদের মুখ একবারের জন্যেও মনে পড়েনি। আর সে কথা একটুও ভাবতে চাই না। নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে কখনও ভাবব না। আমার অতীত আমি এই মুহূর্তে একদম ভুলে যেতে চাই। দার্জিলিং কিংবা কার্শিয়াং-এ আমি চাকরি পেলেই একটা বাড়ি ভাড়া নেব। সুর্মার যদি ইচ্ছে হয় তাহলে পড়াশুনা করবে, আমি কোনও আপত্তি করব না। ব্যাপারটা ভাবতেই আমার খুব ভালো লাগছিল।

ট্রেনের স্পিড কমে আসতে আমি দূরে লোকালয় পেলাম। সুর্মা চুপচাপ বসেছিল। আমি তোয়ালেটা বের করে বললাম, 'যা, বেসিন থেকে মুখ ধুয়ে আয়।'

ও ক্লান্ত চোখে আমার দিকে তাকাল, কী ভাবল, তারপর ধীরে-ধীরে উঠে গেল টয়লেটে। আমি ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে অন্য টয়লেট থেকে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসতেই দেখলাম সুর্মা ব্যাগটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। যাত্রীদের ঠেলাঠুলির মধ্যে আমরা চেকারের পেছন-পেছন বেরিয়ে এলাম। সবাই যেদিকে যাচ্ছে চেকার সেদিকে গেল না। বাঁদিকের একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল, 'ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও।' সেখানে আরও কিছু কালোকোট পরা লোক ছিল তারা আমাদের দেখে হাসল। আমি আর কথা বাড়ালাম না। সুর্মাকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটু ঘুরে ওভারব্রিজ পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এক দঙ্গল রিকশা আর ট্যাক্সির সঙ্গে কয়েকটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে চায়ের স্টল দেখে সুর্মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'চা খাবি?'

সুমা মাথা নাড়ল, 'আমি চা খাই না।' তারপর একটু থেমে বলল, 'আমরা কোথায় যাব?'

'কার্শিয়াং।'

খোঁজাখুঁজির পর একটা ছোট বাস আমরা উঠলাম। বাসটা দার্জিলিং যাচ্ছে। বেশিরভাগ লোকই দেহাতি, দু-তিনজন বাঙালি অবশ্য আছে। আমরা জানলার ধারে জায়গা পেয়ে গিয়েছিলাম। গাড়িটা যখন ছেড়েছে ঠিক তখনই নজরে পড়ল একটা পুলিশের জিপ দ্রুত এসে স্টেশনের বাইরে থামল। জিপটাকে দেখেই আমার বুক ধ্যাঁৎ

করে উঠেছিল। আমি জানি না কী জন্যে জিপটা স্টেশনে এল, কিন্তু মনে হল আমরা যে সময়মতো বাসে উঠে বসেছি সেটা ভাগ্য ভালো বলেই। কথাটা সুর্মাকে বলব কি না বুঝতে পারছি না। ও যদি নার্ভাস হয়ে যায় কিংবা পুলিশে কাছে ধরা দেয়? আমি এখনও ওকে এ ব্যাপারে বিশ্বাস করব না। একটু বাদেই বুঝলাম এই বাসটাতে টুরিস্টদের ভিড় নেই কেন। এমন লড়ঝড়ে বাস পাহাড়ে উঠতে পারবে কি না আমার সন্দেহ হচ্ছিল।

মনের মধ্যে পুলিশ দেখার পর যে ভয়টা জন্মেছিল সেটা তাড়বার জন্য সুর্মার সঙ্গে কথা বললাম, 'এই তুই এর আগে কখনও দার্জিলিং যাসনি তো, না?

সুর্মা মাথা নাড়ল, 'না'।

আমি বললাম, 'আমাকে একটু ভালোবাসতে পারবি তো?'

ওর ঠোঁটে একটুকরো হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। আমার খুব ইচ্ছে করছিল ওর হাত ধরি, কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না। আজ সকাল থেকেই কেন জানি না মনে হচ্ছে সুর্মা আমার চেয়ে অনেক বেশি বোঝে, আমার চেয়ে ও অনেক গম্ভীর। নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে ওর তুলনায়। অথচ ও তো আমার চেয়ে দশ মাসের ছোট।

বেশ জমজমাট একটা শহরে আমরা এলাম। প্রচুর লোক আর রিকশা দাঁড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে। সুর্মাকে বললাম, 'কিছু খাবি না? খুব খিদে পেয়েছে।'

'কী খাবি?'

'দাঁড়া, তুই বোস আমি দেখে আসি কী পাওয়া যায়! ব্যাগটাকে লক্ষ রাখিস।'

বাস থেকে কোনওমতে নামলাম। কারণ প্রচুর নেপালি ওঠার জন্যে ঠেলাঠুলি করছে। বেশ ঠান্ডা লাগল মাটিতে নেমে। জায়গাটা মোটেই পাহাড়ি নয়। আমি একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকে সিঙাড়া আর জিলিপি কিনলাম। তারপর চট করে এক গেলাস চা নিয়ে চুমুক দিলাম। সুর্মা খায় না তাই খাবার খাওয়ার আগেই চা খেয়ে নিই।

বাসটা হর্ন দিচ্ছিল আর কন্ডাক্টর চেঁচাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি বাসের দরজায় পা রাখলাম। মানুষের ঠাসাঠাসি হয়ে গিয়েছে ভেতরটা। একে ঠেলে ওকে ঠেলে কোনওরকমে যখন সুর্মার পাশে বসলাম তখন দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়! আমার ঘাড়ের কাছে একটি নেপালি বউ ঝুঁকে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সুর্মার হাতে ঠোঙাটা দিতে ও নিচু গলায় বলল, 'পুলিশ এসেছিল।'

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল আমার। বললাম, 'কখন?'

'তুই নামবার পরেই। জানলা দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল কী নাম আমার?'

'তুই কী বললি?'

'মিথ্যে বললাম। তারপর জিজ্ঞাসা করল, সঙ্গে কে আছে? আমি বললাম, মামা। লোকটা আমাকে ভালো করে দেখে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছি?'

'তুই কার্শিয়াং বললি?'

'না, শুকনা বললাম।'

আমি অবাক হলাম। শুকনা যে এই রাস্তার কোনও জায়গার নাম আমিই জানি না। সুর্মা হেসে বলল, 'কন্ডাক্টর জায়গার নাম ধরে চেঁচাচ্ছিল তাই জেনেছিলাম।'

'লোকটা কী বলল?'

'আর কিছু না বলে চলে যাচ্ছিল। আমিই জিজ্ঞাসা করলাম, কেন প্রশ্ন করছেন? ও উত্তর দিল, আমরা দুটো বাচ্চাকে খুঁজছি। মনে হয় আমার কথা অবিশ্বাস করেনি।'

কথাটা শোনামাত্র আমার ভয় কেটে আনন্দ হল। গাড়ির চাকা ঘুরতেই আমি খপ করে ওর হাত চেপে ধরলাম খুশিতে। সুর্মা হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আঃ লাগছে।'

খাবারটা খেয়ে নিয়ে আমি চোখ বন্ধ করলাম। তাহলে সত্যি পুলিশ আমাদের খুঁজছে। আমরা যে এদিকে এসেছি তাও টের পেয়ে গেছে। তার মানে দিলীপ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অথচ ও শপথ করেছিল—কোনওদিন যদি ব্যাটাকে পাই আমি দেখে নেব। দিলীপ যদি সব কথা বলে থাকে তাহলে সুনীল প্রধানের নামও পুলিশ জেনে যাবে। অথচ ওর ওখানে না গিয়েও তো আমাদের কোনও উপায় নেই। কী যে করি বুঝতে পারছি না। তবে পুলিশ যখন শিলিগুড়ি কিংবা স্টেশনে আমাদের সন্ধান পায়নি তখন হয়তো ভাবতে পারে আমরা দার্জিলিং-এ যাচ্ছি না। সেইটুকুই যা চান্স। দেখি, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে।

তবে আমার যেটা লাভ হল সেটার সঙ্গে এই দুশ্চিন্তার কোনও তুলনা হয় না। সুর্মা আমার দলে এসে গিয়েছে। পুলিশের লোকটাকে ও যেভাবে কাটিয়েছে তার তুলনা হয় না। ও তো স্বচ্ছন্দে পুলিশকে সব কথা বলে দিতে পারত। কিন্তু তা করেনি। এতেই বোঝা যাচ্ছে ওর কাছ থেকে আমার কোনও ভয় নেই। কাল রাত্রে আমি ভাবছিলাম স্টেশনে চমৎকার অভিনয় করেছি রেলের পুলিশের সঙ্গে। কিন্তু তখন ও যা করেছে তা আমার চেয়ে কম কিছু নয়। আমরা দুজনে একসঙ্গে যদি ফন্দি আঁটতে পারি তাহলে পুলিশকে এড়ানো সম্ভব হবেই।

এই সময় সুর্মা বলল, 'দ্যাখ কী সুন্দর!'

আমি বাইরে তাকালাম। যদিও নেপালি বউটা আমায় খুব চাপ দিচ্ছে তবু পাহাড়টাকে এগিয়ে আসতে দেখে খুব ভালো লাগল। আমরা এখন লোকালয় ছাড়িয়ে এসেছি! চারধারে গাছপালা এবং সূর্য বেশ ওপরে। সুর্মা বলল, 'ওগুলো নিশ্চয়ই চায়ের গাছ, না রে?'

চা-গাছ আমি কখনও দেখিনি। তবে ছবিতে চা-তোলা কামিনদের ছবি দেখেছি। বললাম, 'হ্যাঁ।'

সুর্মা বলল, 'বিউটিফুল! এরকম জায়গায় আমি সারাজীবন থাকতে পারি!' সুর্মার কথা বলার ভঙ্গি এখন বেশ সহজ, সাবলীল। তার মানে ও এতক্ষণে মন ঠিক করে নিতে পেরেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে তাহলে নামি, কী বল?'

ও চকচকে চোখে হাসল, 'তুই না—'

'আমি কী?'

'মিথ্যেবাদী।' বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল সুর্মা।

আমি বললাম, 'নিজে কী? পুলিশটাকে যা বললি তাতে আমার চেয়ে কম যাস না।' আমি কী শেষপর্যন্ত সুর্মার মন পেয়ে গেছি! ব্যস, আমার মনের সব কষ্ট দূর হয়ে গেল।

লালবাজার থেকে দুপুরে খবর এল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে দার্জিলিং মেল থেকে যারা নেমেছে তাদের মধ্যে সুর্মাদের পাওয়া যায়নি, শিলিগুড়ি শহরেও চেক করা হয়েছে! দার্জিলিং-এর এস.পি.কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, যদি কোনও ফাঁকে ওরা ওখানে পৌঁছে যায় তাহলে লোকেট করতে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রণব যে খবরটা আনল তাতে স্বপ্নেন্দু উত্তেজিত হলেন। গতকাল সন্ধেবেলায় শিয়ালদার প্লাটফর্মে দুটি তরুণ-তরুণী ঝগড়া করছিল। রেলের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে জানে তারা ভাইবোন। মেয়েটিও একই কথা বলায় পুলিশ তাদের ট্রেনে তুলে দিয়েছে। পোশাকের বর্ণনা শুনে কারও বুঝতে বাকি রইল না মেয়েটি সুর্মা।

প্রণব বলল, 'ওরা পুলিশকে ধাপ্পা দিয়েছে। তোমার মেয়ে যদি ছেলেটির সঙ্গে প্ল্যান না করে থাকে তা হলে সে-ও মিথ্যে বলল কেন?'

স্বপ্নেন্দু নার্ভাস গলায় বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না। হয়তো লজ্জা কিংবা আমাদের অপমান হবে ভেবে, কী জানি। সুর্মি এত সেন্টিমেন্টাল, চাপা, যে ওর মনে কী হচ্ছে বোঝা মুশকিল। কিন্তু ওদের যদি ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে কোথায় গেল? নিউ জলপাইগুড়িতে পাওয়া যায়নি বলছে!'

প্রণব বলল, 'সেটাই কথা। হয়তো মাঝখানের কোনও স্টেশনে নেমে গেছে। যাই বলো, এখন মনে হচ্ছে তোমার মেয়ের সহযোগিতা আছে।'

স্বপ্নেন্দু কথাটাকে কিছুতেই মানতে পারছেন না, অথচ প্রতিবাদ করার কোনও উপায় নেই। সুর্মা তো স্বচ্ছন্দে পুলিশকে সব কথা বলতে পারত।

স্বপ্নেন্দু অসহায় চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। কাল সারারাত কান্নাকাটির পর আজ সুর্মার মা অনেক শক্ত হয়ে গেছেন। তিনি চুপচাপ এঁদের কথা শুনছিলেন। এবার বললেন, 'পুলিশ তো ভুল করতেও পারে। আমার মনে হচ্ছে ওরা দার্জিলিং-এ গেছে। তুমি আমাকে আজই সেখানে নিয়ে চলো।'

স্বপ্নেন্দু বিহ্বল গলায় বললেন, 'দার্জিলিং-এ যাবে?'

সুর্মার মা বললেন, 'হ্যাঁ। আমি নিজে গিয়ে ওকে নিয়ে আসব। আজকেই কোনওমতে ওখানে পৌঁছনো যায় না?' প্রশ্নটা প্রণবের উদ্দেশ্যে।

প্রণব ঘড়ি দেখল, 'না, আজ ওখানে পৌঁছনোর কোনও উপায় নেই। প্লেন ধরতে পারবেন না। যদি যেতেই হয় তা হলে দার্জিলিং মেল ধরাই ভালো।'

স্বপ্নেন্দু বললেন, 'টিকিট পাওয়া যাবে?' বলেই লজ্জিত হলেন। কাল ওই বাচ্চা মেয়েটা তো বিনা টিকিটেই হয়তো ট্রেনে উঠেছে আর তিনি টিকিটের কথা চিন্তা করছেন।

প্রণব উঠল, 'আমি ব্যবস্থা করছি। তুমি একবার থানা ঘুরে যেও!' প্রণবকে গাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরছেন এমন সময় স্বপ্নেন্দু দেখলেন অতীনের বড়দা আসছে। যতীন বোধহয় ভদ্রলোকের নাম, স্বপ্নেন্দু গুলিয়ে ফেললেন।

যতীন কাছে আসতেই স্বপ্নেন্দু বললেন, 'আমরা খবর পেয়েছি যে ওরা দার্জিলিং গিয়েছে। পুলিশ ওদের খুঁজছে যদিও, তবু আজ আমরা ওখানে রওনা হচ্ছি। আপনারা কেউ আমার সঙ্গে যাবেন?'

যতীন বিরক্ত হল, 'পুলিশে খবর দিতে গেলেন কেন? ঘরের কথা খবর কাগজে

বের হবে! না, আমাদের যাওয়ার সময় নেই।'

স্বপ্নেন্দু অবাক হলেন, 'ওরা অল্পবয়সি, যে কোনও মুহূর্তে বিপদে পড়তে পারে, আপনাদের দুশ্চিন্তা হচ্ছে না?'

'দুশ্চিন্তা করে কী করব বলুন! ওইটুকু ছেলে একটা মেয়ের জন্যে পাগল হয়ে যাবে ভাবা যায়? তা ছাড়া, হাসপাতাল থেকে বলেছে ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। ওর মনের চাহিদা পূরণ না হলে হয়তো আবার পাগল হয়ে যেতে পারে। আপনার মেয়ে সঙ্গে যাওয়ায় মা খুব নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ওঁর ধারণা যে অতীন যদি বিয়ে করতে পারে সুর্মাকে, তা হলে আর পাগল হবে না। সে ক্ষেত্রে খামোকা চেঞ্জ করতে যাব কেন?'

যতীন চলে গেলে স্বপ্নেন্দু খানিকক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। এ কী যুক্তি তিনি শুনলেন? তারপরেই খেয়াল হল মেয়েটা একটা পাগলের সঙ্গে রয়েছে। যদিও ওই পাগলের হাতে বেশ কিছু টাকা আছে এই মুহূর্তে, তবু কোনওমতেই বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি কী করতে পারেন! যদি যাওয়ার চিন্তাটা আর-একটু আগে মাথায় আসত তা হলে আজই প্লেন ধরতে পারতেন। গত রাতটা ওরা ট্রেনে কাটিয়েছে, আজ কোথাও ওঠার আগেই যদি ধরতে পারতেন! সুর্মার যা অভ্যেস, তাতে ও এখন একা-একা কী করছে কে জানে। যে মেয়ে রাত্তিরে একা শুতে পারে না সে কী করে—! কথাগুলো যত ভাবছিলেন তত বুকের মধ্যে হিম ঝরছিল। তিনি চেয়ে দেখলেন সকালের কলেজ ছেড়ে পাড়ার মেয়েরা বাড়ি ফিরছে। দাঁতে ঠোঁট চাপলেন স্বপ্নেন্দু। তারপর কিশোরীদের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললেন, 'বোকা মেয়েরা।'

পাহাড় যে এত সুন্দর হয় জানতাম না। অনেকের কাছে শুনেছি পাহাড়ে উঠতে গেলে মাথা ঘোরে, বমি হয়, কিন্তু আমার কিছুই হয়নি। জানলা অবশ্য বন্ধ করে দিতে হয়েছিল খানিক পরেই, কারণ ঠান্ডা বাতাস আসছিল। আমার সঙ্গে তো কোনও দ্বিতীয় রুমাল পর্যন্ত নেই। কী করে পাহাড়ের ঠান্ডায় থাকব বুঝতে পারছিলাম না। বাসি জামাকাপড় কাল থেকে পরে আছি, কিন্তু মনে কোনও বিকার হচ্ছে না। মা থাকলে হয়ে যেত আমার! আজ সকাল থেকে মা-বাবার জন্য কষ্ট হচ্ছে যদিও, তবু বুঝতে পারছি আর আমার ফেরার কোনও উপায় নেই। বাবাকে সব কথা খুলে চিঠি লিখব, আমি ঠিক জানি বাবা আমাকে বুঝতে পারবেন। উনি বলেন, মানুষ ভুল করে এবং মানুষ বলেই সেটা শুধরে নেয়। কিন্তু আমি তো কোনও ভুলই করিনি। একথা, জানি এখন কেউ বুঝবে না। বাবাও কি বুঝবেন না?

অতীন সেই পাহাড়ে ওঠার পর থেকেই সিটে মাথা এলিয়ে ঘুমুচ্ছে। ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেন জানি না অন্যরকম লাগছিল। কী সরল, এবং ভালো মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে খুব অসহায়ও। আসলে অতীন তো ঠিক ক্রিমিনাল কিংবা লম্পট নয়। এটুকু বুঝতে পেরেছি, আমি না চাইলেও ও আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে। কী জানি কেন, এতে আমার বেশ গর্ব হচ্ছে। আমার জন্যে একটা ছেলে এরকম ঝুঁকি নিচ্ছে। বোধহয় এই কারণেই আমি শিলিগুড়িতে মিথ্যে কথা বললাম পুলিশের কাছে।

মিথ্যে কথা একবার বলতে আরম্ভ করলে আর অসুবিধে হবে না। বেশ নাটক-নাটক মনে হয়।

এবার আমার বেশ শীত করছে। শীত-শীত ভাবটা অনেকক্ষণ থেকেই ছিল, এবার জাঁকিয়ে এল। আমার তো গরম জামাকাপড় নেই, বাসে যায় দিকেই তাকাই তার গায়ে কিছু না কিছু রয়েছে। এভাবে দার্জিলিং-এ নিশ্চয়ই কেউ যায় না। অতীনের বোধহয় শীত করছিল কারণ ও বেশ কুঁকড়ে আছে। হঠাৎ চোখ মেলে বলল, 'খুব শীত করছে রে!' তারপর দ্রুত ব্যাগটা টেনে নিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সোয়েটার বের করল। তারপর আর-একটা। বলল, 'ভাগ্যিস আসার সময় দুটো এনেছিলাম। ময়লা হলে অন্যটা পরব ভেবেছিলাম। তুই এই লালটা পর।'

দুটোই ফুল-স্লিভ। আমি আর দ্বিরুক্তি করলাম না। সোয়েটারটা মাথা গলিয়ে নিলাম। একটু টাইট হলেও বেশ ভালো লাগছে। আমারটা গলা তোলা, আর শীত লাগছে না। নিজেকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল কিন্তু উপায় নেই। অতীন হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝলাম আমাকে নিশ্চয়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। গাড়িটা এখন এঁকেবেঁকে শুধু উঠছে তো উঠছেই। মাঝে-মাঝে জনবসতি পেলেই কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিচ্ছে। বাঁ দিকে গভীর খাদ আর ডান দিকে খাড়া পাহাড়, একটু বেঁকে গেলেই নিচে গড়িয়ে পড়ব। হঠাৎ হাতস্পর্শ পেতেই ফিরে তাকালাম। অতীন একটা ছোট চিরুনি এগিয়ে দিচ্ছে। মনে পড়ল আমি সকাল থেকে চুল আঁচড়াইনি। কৃতজ্ঞ হলাম, অতীনের ওপর মনটা খুশিতে ভরে গেল। অত ছোট চিরুনিতে আমার চুল ম্যানেজ করা যায় না ভালো করে, তবু গুছিয়ে নিলাম। অতীন ফিসফিস করে বলল, 'আমি তোকে ভীষণ ভালোবাসি সুর্মি!'

ওর গলার স্বরে কী যেন ছিল, আমি সোয়েটারের ভেতরেও কেঁপে উঠলাম। আমি জানি না কেন, ওর দিকে আর তাকাতে পারলাম না। অতীন চোখ বন্ধ করল। আমার হাত ধরল না কিংবা অন্যভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। শুধু শরীরটাকে বাসের সিটে এলিয়ে দিল। যেন ডুবে থাকল।

কার্শিয়াং-এ আমরা নামলাম না। তার আগের একটা ছোট্ট বাজারমতো এলাকায় বাস দাঁড়াতেই অতীন উঠে বসল। তারপর ওপাশে দাঁড়ানো একটা নেপালিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কার্শিয়াং আর কতদূর?'

'দো মাইল।'

অতীন বলল, 'এই সুর্মি, উঠে পড়। আমরা এখানেই নামব।'

'এখানে? এটা তো কার্শিয়াং নয়।' আমি অবাক হলাম।

'জানি। কিন্তু কার্শিয়াং-এ নামলে বিপদ হতে পারে। এখানে নেমে তারপর ভাবব কী করে যাওয়া যায় ওখানে।' ব্যাগটাকে হাতে নিয়ে অতীন ভিড় সরিয়ে আমাকে নামিয়ে আনল কী সুন্দর। কুয়াশারা দল বেঁধে নেমে আসছে আমাদের দিকে। ছোট-ছোট টিনের ছাদ-ওয়ালা কাঠের ঘর। দু-তিনটে সবজির দোকান। সবাই নেপালি নয়, কয়েকটি মাড়োয়ারি আছে। বাস ছাড়িয়ে আমরা একটু এগোতেই অতীন বলল, 'দ্যাখ-দ্যাখ, ওঃ কী সুন্দর।'

ততক্ষণে আমারও চোখ পড়েছে। বাঁদিকে আকাশের গায়ে ঝকঝক করছে বরফের

চূড়া। ওখানে মেঘ নেই, কুয়াশা নেই। এত নীল আকাশ, ওরকম সোনালি বরফের পাহাড় আমাকে পাথর করে দিল। নিশ্চয়ই ওটা কাঞ্চনজঙ্ঘা। আমার হঠাৎ ওই দিকে তাকিয়ে কান্না পেয়ে গেল। কেন পেল জানি না। অতীন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুর্মি, তুই কাঁদছিস?'

আমি দ্রুত চোখ মুছে নিলাম। তারপর বললাম, 'কোথায় যাবি এখন?'

অতীন চারপাশে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'তোর চোখে জল দেখলে আমার নিজেকে ক্রিমিনাল মনে হয়! কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি তোকে ভালোবাসি।'

আমি হাসবার চেষ্টা করলাম, 'না, আর কাঁদব না। তবে তুই যত তাড়াতাড়ি পারিস আমাকে একটা খাম আর কলম এনে দিবি?'

'কেন?'

'বাবাকে সবকথা খুলে একটা চিঠি লিখব।'

'কেন?'

'বাবার কাছ থেকে আমি কিছুই লুকোতে পারব না।'

'ঠিক আছে।' অতীন কথাটা বলল বটে কিন্তু বুঝতে পারছিলাম যে ও মন থেকে কথাটা বলল না। সামনেই একটা খাবারের দোকান দেখে ও এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ডাকল, 'আয়, এখানে আমরা খেয়ে নিই।'

এরকম মোটা রুটি আর তরকারি আমি কখনও খাইনি। কোনওরকমে যা পারি খেয়ে হাত ধুতেই মনে পড়ল ডায়েরিটার কথা। কাল স্বপ্নাদের বাড়ি থেকে বের হবার পর ওটা হাতে ছিল। কোথায় ফেললাম? ট্যাক্সিতে না ট্রেনে? ওতে অনেক জরুরি নোটস, ঠিকানা লিখেছিলাম। তারপরেই ভাবলাম যাক, এখন ওই ডায়েরিতে আর আমার কী দরকার!

বিকেলবেলায় আমরা সোজা দার্জিলিং-এ চলে এলাম। অতীনের এরকম ইচ্ছে ছিল না। খাওয়ার পর ও আমাকে একটা কালভার্টের ওপর বসে সব কথা বলছে। সুনীল প্রধান-এর বাড়ি যদিও কার্শিয়াং-এ কিন্তু ও পড়ে দার্জিলিং কলেজে। সুনীলের বাড়িতেই ওঠার পরিকল্পনা ছিল অতীনের। কারণ দার্জিলিং-এ সবাই বেড়াতে যায়, সেখানে চেনা লোকের দেখা পাওয়া যাবেই। আমরা ঠিক করলাম বাসে উঠব না। কারণ বাসস্ট্যান্ডে পুলিশ থাকতে পারে। অতীন বিদেশের কায়দায় হাত দেখিয়ে গাড়ি থামাচ্ছিল। আমাদের কপাল ভালো তাই দ্বিতীয় গাড়িটাই দাঁড়িয়ে গেল। একটা নেপালি মেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। খুব স্মার্ট এবং সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'লিফট্ চাও?'

আমরা দুজনেই একসঙ্গে ঘাড় নাড়তে সে পেছনের দরজা খুলে দিল। গাড়িতে উঠে আমি বুঝলাম যাকে আমি মেয়ে ভেবেছি সে আসলে মহিলা। ত্রিশের অনেক বেশি বয়স। গাড়ি চালাতে-চালাতে জিজ্ঞাসা করল, 'কোত্থেকে আসছ?'

আমি জবাব দিলাম, 'কলকাতা।'

'কোথায় উঠবে?'

অতীন উত্তর দিল, 'হোটেলে।'

মহিলা সামনের আয়নার আমাদের দেখে নিল কিন্তু কিছু বলল না। একটু

বাদেই কার্শিয়াং-এ এসে গেল। আমরা সাইনবোর্ডে জায়গার নাম দেখতে পেয়ে নড়েচড়ে বসলাম। একটা চৌমাথার মোড়ে ভিড়ের জন্য গাড়িটা আটকে গেল। চারজন পুলিশ দুটি অল্পবয়সি ছেলেমেয়েকে জেরা করছে। ওরা প্রচণ্ড প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও পুলিশরা বোধহয় বিশ্বাস করছে না। রাস্তার লোক এই দেখে মজা পেয়ে ভিড় জমিয়েছে। মহিলা গাড়ি ছাড়লে অতীন যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। আমাকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'কার্শিয়াং-এ নামব না, দার্জিলিং-এই চল।' ভাগ্যিস মহিলাকে আমরা গন্তব্যস্থল বলিনি তাই তিনি প্রশ্ন না করে গাড়ি চালাতে লাগলেন একমনে। ছায়া ঘনিয়ে আসছে। শীত সোয়েটারের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে। হঠাৎ মহিলা কথা বললেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই ভাই-বোন নও! তাই না?' উনি আমাদের দিকে মুখ ফেরাননি। আমি অস্বস্তি বোধ করলাম, 'কী করে বুঝলেন?'

'তোমরা আমার বয়সে এলেই বুঝতে পারবে। দার্জিলিং-এ এর আগে এসেছ?'

'না?'

'কোন হোটেলে উঠবে ঠিক করেছ?'

'গিয়ে খুঁজে নেব একটা।'

'দ্যাটস নট সো ইজি মাই ফ্রেন্ড! এখন দার্জিলিং-এ হেভি রাশ, তার ওপর সন্ধে হয়ে যাবে পৌঁছাতে। ইউ উইল বি ইন রিয়েল ট্রাবল!'

ভয় পেয়ে যাচ্ছিলাম। শীতের মধ্যে দার্জিলিং-এ রাত্রে কোথায় থাকব? আর তারপরেই বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। রাত্রে আমি কখনও একা শুতে পারি না। ছেলেবেলা থেকেই এইরকম অভ্যেস হয়ে গেছে! আজকে আমার সঙ্গে কে শোবে? আমি অতীনের দিকে তাকালাম! অতীন? না, অসম্ভব। আমি ওর সঙ্গে এক ঘরে শুতে পারব না। আবার কান্না পাচ্ছিল কিন্তু সেই সময় অতীন চাপা গলায় বলল, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই! সুনীল ঠিক ম্যানেজ করে দেবে।'

দার্জিলিং-এ পৌঁছে মহিলা বলল, 'তোমাদের কোথায় নামাব?'

অতীন জবাব দিল, 'এখানেই নামিয়ে দিন না!'

'এখানে নেমে কী করবে? এখানে কোনও হোটেল নেই। এখানে তোমার জানাশোনা কেউ আছে?' মহিলাকে চিন্তা করতে দেখলাম।

'হ্যাঁ। কলেজ হোস্টেলে—।'

'দ্যাটস্ গুড। তোমরা এক কাজ করতে পারো। আমার ওখানে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে তুমি ফ্রেন্ডকে খুঁজে বের করে হোটেল দেখে ওকে নিয়ে যেও। ওকে নিয়ে হোটেলে-হোটেলে ঘোরা ঠিক হবে না।' বলে সম্মতির অপেক্ষা না করে গাড়ি চালাতে লাগলেন। অতীনের এই ব্যবস্থা পছন্দ হল না বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার মন্দ লাগল না। আমার এখন বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হওয়া একান্তই দরকার।

মহিলার বাড়ি স্টেশন ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে। এটা বলতে পারছি কারণ আসার সময় স্টেশনটাকে দেখতে পেয়েছিলাম। সুন্দর লন পেরিয়ে গাড়িটা থামল। মহিলা জানলার কাচ তুলে দিয়ে বললেন, 'এবারে এসো।' বাড়িটাকে স্পষ্ট বুঝতে না পারলে বুঝতে পারলাম এঁরা বেশ বড়লোক। একটা দারোয়ান গোছের লোক মহিলাকে সেলাম করল। প্রথমেই একটা বিরাট হল ঘর। পায়ের তলায় পুরু কার্পেট। মহিলা বলল, 'তোমরা

এখানে বিশ্রাম করো। ওপাশে একটা টয়লেট আছে। ইচ্ছে করলে ব্যবহার করতে পারো। আমি চেঞ্জ করে আসছি।'

অতীন খুব নার্ভাস হয়ে গেছে, আমারই মতন। কী সুন্দর সোফা, ঘরে একটা হালকা নীল আলো জ্বলছে। অতীন বলল, 'যাচ্চলে! কোথায় এলাম।' তারপর সোফায় বসল। দেখলাম অনেকখানি ডুবে গেল ও। আমি একটু দ্বিধা করে টয়লেটে গেলাম। এমন সুন্দর টয়লেট আমি জীবনে দেখিনি। ইংরেজি সিনেমার মতন। ইচ্ছে করছিল গরম জলের শাওয়ার খুলে স্নান করে নিই। কিন্তু নতুন জায়গায় সাহস পেলাম না। আয়নায় নিজেকে দেখলাম। ইস, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় আমার চেহারা কতখানি পালটে গেছে!

চা খেতে-খেতে মহিলা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার পরিচিতজন কোথায় থাকেন, ঠিকানাটা কী?'

অতীন সুনীল প্রধানের ঠিকানা জানাল। মহিলার কপালে ভাঁজ পড়ল, 'একে তুমি কী করে চিনলে? ছেলেটি তো নেপালি।'

অতীন জবাব দিল, 'আমরা একসঙ্গে পড়তাম।'

চা-খাওয়ার পর মহিলার কাছ থেকে পথের নির্দেশ নিয়ে অতীন উঠল। আমার হঠাৎ মনে হল অতীন চলে গেলে আমি খুব একা হয়ে যাব। আমিও তো ওর সঙ্গে যেতে পারি! কিন্তু অতীনটা আমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছে না। অতএব এই অপরিচিত মহিলার বাড়িতে আমি একাই রয়ে গেলাম।

চা খেতে নামার সময় মহিলা পোশাক পাল্টে এসেছে। ম্যাক্সির ওপর সোয়েটার মনে হয়েছিল, কিন্তু লক্ষ করে বুঝলাম ওটা ঠিক ম্যাক্সি নয়। কলকাতায় ভুটানিদের পরতে দেখেছি। ছুম্বা না কী একটা বলে ওটাকে। মহিলা বলল, 'এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করা যাক।' বলে উঠে দাঁড়ালেন। আমি ওঁকে অনুসরণ করে কাঠের রঙিন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় এলাম। পাশাপাশি চারটে ঘরের একটায় ঢুকে আলো জ্বাললেন। একটা ডাবল বেড সোফা এবং টি ভি সেট।

সোফায় বসে মহিলা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কী?'

একটু ইতস্তত করে সত্যি কথা বললাম। আমার নামটা কয়েকবার উচ্চারণ করল মহিলা তারপর বলল, 'বাঃ দারুণ নাম। পড়াশুনা করো!'

'হ্যাঁ, কলেজে।' কলেজ বলতে ভালো লাগল।

'ওকে তুমি ভালোবাস?'

কী বলব? গতকাল কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমি চিৎকার করে না বলতে পারতাম কিন্তু এখন সেকথা বলতে পারছি কি! মহিলা হাসল, 'বুঝেছি, কিন্তু তোমরা যে এখানে এসেছ তা তোমাদের মা-বাবা জানেন?'

আমি বললাম, 'আমি জানাবার সুযোগ পাইনি।'

'আই সি। কী নাম ওর?'

'অতীন।'

'এখানে কি শুধুই বেড়াতে এসেছ?'

'না। অতীন চাকরির খোঁজে এসেছে।'

'আচ্ছা! সুনীল ওকে কথা দিয়েছে?'

'হ্যাঁ!'

'তুমি একটা বোকা, ভীষণ বোকা মেয়ে। এইভাবে অনিশ্চয়তার ভেসে পড়তে হয়? জানো না, আমাদের মেয়েদের জন্যে পায়ে-পায়ে বিপদ হাঁ করে বসে আছে। এত ইমোশনাল হলে চলে! তোমার সঙ্গে তো একটাই ব্যাগ দেখছি। জামাকাপড় ওতে আছে?'

'অতীনের আছে, আমার নেই!'

'স্ট্রেঞ্জ, তুমি নিশ্চয়ই বলবে না এক কাপড়ে চলে এসেছ!'

মাথা নামালাম, 'হ্যাঁ, তাই।'

মহিলা বোধহয় কিছুক্ষণ আমায় দেখল, তারপর উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, জানি না এসব কথা এঁকে বলে ভালো করলাম কি না! অতীন জানলে হয়তো রেগে যেতে পারে। কিন্তু ওঁর কথা বলার ভঙ্গিতে এমন আন্তরিকতা মাখানো যে না বলে পারিনি। একটু বাদেই মহিলা সুন্দর একটা ম্যাক্সি আর শাল নিয়ে ফিরে এল। 'যাও ওই টয়লেট থেকে এগুলো পরে এসো। এক জামাকাপড়ে বেশিদিন থাকতে নেই।'

আমি কখনও অন্যের জামা-কাপড় পরিনি এক অতীনের এই সোয়েটারটা ছাড়া। তবু মনে হল ওগুলো পরলে আমি ফ্রেশ হব। এ ঘরের লাগোয়া টয়লেটে চেঞ্জ করে এলাম। মহিলা বলল, 'বাঃ, চমৎকার। তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। নাইস্! বসো। তুমি তো আমার নাম জিজ্ঞাসা করলে না? আচ্ছা বলো তো আমার বয়স কত?'

আমি সত্যি অনুমান করতে পারিনি ওর বয়স এখন চল্লিশ। কথাটা মোটেই মানতে ইচ্ছে করে না অবশ্য। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের হলে মানিয়ে যায়। কিন্তু ওর মেয়ের বয়স নাকি আঠারো। কলকাতার লরেটো কলেজে পড়ে। আজ দুপুরে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে তাকে তুলে দিয়ে ফেরার পথে আমাদের সঙ্গে দেখা। মেয়ের ছবি আছে ওর লকেটে, দেখলাম। এতক্ষণে আমি ওঁকে বেশ শ্রদ্ধা করতে লাগলাম। মহিলার নাম জিনা দোরজি। সিকিমের মানুষ। তাই অমন লম্বাটে, নাক-চোখও চাপা নয়। স্বামী বছর তিনেক হল মারা গিয়েছে। এই বাড়িটায় মহিলা একা থাকে। ইচ্ছে করেই দার্জিলিং-এ পড়ায়নি মেয়েকে। সে নাকি পড়াশুনায় ভালো কিন্তু চেহারা এত সুন্দর যে ছেলেরা ওর মাথা খারাপ করে দিচ্ছিল। বিশেষ করে ওই সুনীল। কলকাতায় গিয়ে রপ্ত হতে-হতে কলেজটা শেষ করে ফেলবে বলে ওর বিশ্বাস। আমি আর অতীন তো প্রায় মহিলার মেয়েরই বয়সি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি একা থাকতে পারেন?'

'অ্যাদ্দিন পারছিলাম। ঝি-চাকর, এর সঙ্গে মেয়ে ছিল। কিন্তু এখন আর ওরা থাকতে দেবে না!' জিনা হাসলেন।

'কারা?'

'ওই যারা আমাকে বিয়ে করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। আসলে, আমার এই শরীরটাও চায় না যে আমি একা থাকি। মেয়ে পর্যন্ত বলে গেল, মা তুমি বিয়ে করো। থাক আমার কথা। তোমাকে আমার বেশ লেগেছে। আমি বলি কী, তোমরা আজ

রাত্রে এখানেই থেকে যাও! কাল দিনের আলোয় না হয় শিফট করো!' প্রস্তাবটা আমার খুব পছন্দ হল এখন। এই মহিলার কাছে থাকলে আমি নিরাপদে থাকব—এইরকম মনে হচ্ছিল। জানি না অতীন এসে কী বলবে।

সুনীল আমাদের অনেকটা পথ এগিয়ে ফিরে গেল। বাইরে এত ঠান্ডা যে আমি কাঁপছিলাম। এই সোয়েটারে কোনও কাজ হচ্ছে না এখন। রাস্তায় একটাও লোক নেই। দোকানপাটও বন্ধ হচ্ছে। সন্ধেবেলায় যখন মহিলার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে নেমেছিলাম তখন দার্জিলিংকে দেখে চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। আলোর হীরে গলায় দুলিয়ে দার্জিলিং তখন হাসছে। জিজ্ঞাসা করে-করে সুনীলের হোস্টেলে গিয়ে পৌঁছেছিলাম ঠিকই। ওদের দারোয়ান আমাকে সুনীলের খোঁজ দিল। সুনীল তখন হোস্টেলে নেই। ম্যালের কাছে একটা রেস্তঁরার ঠিকানা দিয়ে সেখানে খোঁজ নিতে বলল। ম্যালের পথে সাজুগুজু লোকের ভিড়। বেশিরভাগই বাঙালি। যদি চেনা-লোকের মুখোমুখি হতে হয় তাই সাবধানে হাঁটছিলাম।

রেস্তরাঁ যে বেশ বড়লোকি তা দূর থেকে বুঝতে পারলাম। ওটা আসলে বার। বেশ ঝকমকিয়ে বাজনা বাজছে এবং একদল নারী-পুরুষ সেই বাজনার সঙ্গে নৃত্য করছে। আমি দরজার সামনে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে সুনীলকে খুঁজতে লাগলাম। ওই আলো-আঁধারিতে চট করে কাউকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তা ছাড়া, সিগারেটের ধোঁয়ায় হল ভরতি। আমাকে একটা টেবিল দেখিয়ে বসতে বলল বেয়ারা। আমি তাকে সুনীলের নাম বললাম সে মাথা নেড়ে দ্রুত ভেতরে চলে গেল। আমি আর অপেক্ষা না করে তাকে অনুসরণ করলাম। নাচিয়ে নারী-পুরুষের শরীর বাঁচিয়ে এগিয়ে গেলাম ভেতরে। কোণের দিকে জনাপাঁচেক ছেলেমেয়ে প্রায় নেতিয়ে বসে রয়েছে। সুনীলকে বেয়ারা কিছু বলামাত্র সে মুখ তুলে আমাকে দেখে প্রথমে যেন চিনতেই পারল না। তারপর বোধহয় খেয়াল হতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হাই! কবে এসেছ?'

বললাম, 'একটু আগে।'

'কোথায় উঠেছ?' ও আমার সঙ্গে হাত মেলাল।

'ঠিক কোথাও উঠিনি এখনও। আমার চিঠি পেয়েছ?'

'পেয়েছি। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বসো তো আগে। কী খাবে বলো?'

চেয়ার টেনে বসলাম। 'কিন্তু আমার থাকার জায়গাটা—।'

'আরে তুমি দার্জিলিং-এ আছ, কলকাতায় নয়। আজ রাত্রে তুমি আমার হোস্টেলে থাকবে। এই বেয়ারা, আউর এক হুইস্কি।' সুনীল চেঁচিয়ে হুকুম করল। ওরা মদ্যপান করছিল বুঝতে পারছি। সুনীলের এই অভ্যাসটার কথা আমার জানা ছিল না। অন্য চারজন আমায় দেখছে। এই পরিবেশে কী কথা বলব বুঝতে পারছি না। আমার বাঁ-পাশের মেয়েটা বলে উঠল, 'এক নেহি টু।' সুনীল হাত নাড়ল, 'নো। তোমার প্রচুর হয়ে গেছে। মিট মাই ফ্রেন্ড ফ্রম ক্যালকাটা, অতীন। এরা আমার বন্ধু। শ্যাম, লিলি, হ্যারি আর লায়লা।'

ওরা একসঙ্গে বলে উঠল, 'হা-ই!'

আমি কী করব বুঝতে না পেরে বোকার মতো হাসলাম।

আমার বিস্ময় কমার আগেই বেয়ারা হুইস্কি আর জল রেখে গেল। আমি বললাম, 'সুনীল, আমি ড্রিঙ্ক করিনে।'

সঙ্গে-সঙ্গে আমার বাঁ পাশের মেয়েটি ছোঁ মেরে গেলাসটা তুলে নিয়ে ঝুঁকে আমাকে আলটপকা চুমু খেল, 'ওঃ হাই নাইস য়ু আর। আই অ্যাম হেল্পিং য়ু আর।' বলে সামান্য জল মিশিয়ে ঢক করে গিলল মদ।

সুনীল চিৎকার করে উঠল, 'ইউ বিচ্।' অন্য সবাই খিলখিল করে হাসতে লাগল সুনীলের চিৎকার শুনে। এই সময় একটি নেপালি ছেলে দ্রুত আমাদের টেবিলে এসে সুনীলের পাশে গিয়ে তার কানে-কানে কিছু বলল। সুনীলকে খুব অবাক দেখাচ্ছে। সে চাপা গলায় কিছু জিজ্ঞাসা করল। ছেলেটি চটপট উত্তর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ সুনীল উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বের করে টেবিলে ফেলে বলল, 'এনজয় ইওরসেলফ। কেউ যদি আমাকে খোঁজে, বলবে দ্যাখোনি।' তারপর আমাকে ইশারা করে বাঁ-দিকে চলে গেল। আমি যেদিক দিয়ে ঢুকেছিলাম এটা তার উলটো দিক। একটা দরজা ঠেলে করিডোর দিয়ে এগিয়ে আর-একটা দরজার সামনে পৌঁছে সুনীল দাঁড়াল, 'কী ব্যাপার তোমার?'

'মানে?'

'তোমার সঙ্গে জড়িয়ে পুলিশ আমাকে খুঁজছে কেন?'

'পুলিশ তোমাকে খুঁজছে?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র জানতে পারলাম। তুমি কি আমার হোস্টেলে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। দারোয়ানের কাছে শুনলাম তুমি এখানে।'

'তুমি চলে আসার পরই পুলিশ সেখানে গিয়েছে। যদি দারোয়ান তাদের বলে দেয় জায়গাটার কথা। নাউ, লেটস মুভ।' পেছনের সিঁড়ি দিয়ে সুনীল আমাকে নিচে নামিয়ে আনল। তারপর জোরে পা চালিয়ে বেশ কয়েকটা গলি পেরিয়ে একটা দর্জির দোকানে ঢুকে পড়ল। দোকানে তখন বুড়ো বসে ঢুলছে। তাদের বিদেয় করে সুনীল বলল, 'কী হয়েছে বলো, শুনি।'

আমি তখন তাকে সবকথা খুলে বললাম। সুর্মাকে আমার সঙ্গে আনার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। ওকে আনার ফলেই এক সমস্যা এসেছে। আমরা পুলিশ স্টেশনে, শিলিগুড়িতে এবং সম্ভবত এখানকার বাসস্ট্যান্ডে ফাঁকি দিয়েছি। পুলিশ কিছুতেই জানতে পারেনি আমরা দার্জিলিং-এ এসেছি।

সুনীল হাসল, 'তুমি তো দারুণ রোমান্টিক! মেয়েটি দেখতে কেমন?'

'আমার চোখে ওর মতো সুন্দরী কেউ নেই।'

'ইজ ইট? কিন্তু এই রাত্তিরে তাকে রেখেছ কোথায়?'

তখন আমি ওই মহিলার কথা বললাম। আমি তার নাম জানি না কিন্তু চেহারা, আর গাড়ির বর্ণনা দিতেই সুনীল বুঝে ফেলল, 'আই সি! শি ইজ কলড দার্জিলিং কুইন। বিরাট লাইন ওর পেছনে। ইউ আর লাকি! ওই যে শ্যামকে দেখলে, ওর মেয়েকে শ্যাম সিডিউস করেছিল।'

'ওর মেয়ে? ওর বড় মেয়ে আছে?'

'ইয়েস। সি ইজ অ্যারাউন্ড আওয়ার এজ। তুমি কি কচি খুকি ভেবেছিলে? ছেড়ে

দাও। চেষ্টা করো ওখানে আজকের রাতটা থেকে যেতে।'

'কী করে বলব?'

'বলবে আমার দেখা পাওনি। ট্রাই টু ম্যানেজ হার। তোমার ভাগ্য খুবই ভালো যে হোটেলে ওঠনি। আর হ্যাঁ, ওকে আমার নাম বলবে না। আমি আজ রাত্রেই কার্শিয়াং-এ নেমে যাচ্ছি। তুমি কাল সকালে তোমার প্রেমিকাকে নিয়ে কার্শিয়াং চলে এসো। স্টেশনের বাঁ দিকে পানবাহার নামে একটা দোকান আছে। সেখানে আমার কথা বললে তুমি পৌঁছে যাবে। ও কে?'

'কিন্তু সুনীল, আমার একটা চাকরি চাই!' আমি ওর হাত ধরলাম।

'সিওর। আমি ব্যবস্থা করব। কিন্তু আগে হাওয়াটাকে ঠান্ডা হতে দাও। আমার বাড়িতে তোমরা স্রেফ থাকবে! চলো তোমাকে এগিয়ে দিই।'

আমরা একটু ঘুরপথ হয়েই বোধহয় বড় রাস্তায় এলাম। আর আসতেই ওর দলটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লায়লা বলে মেয়েটি একটা ছেলেকে খুব সাধছিল কিন্তু সে আপত্তি করছে। সুনীলকে দেখামাত্র লিলি ছুটে এল, 'তুমি বেরিয়ে যাওয়ামাত্র পুলিশ এসেছিল।'

'কী বললে?'

'বললাম তোমায় আমরা দেখিনি। কী ব্যাপার?'

'কিছু না। গুডনাইট।'

লায়লা বলল, 'সুনীল, আই অ্যাম নট ফিলিং ওয়েল, একটু এগিয়ে দেবে?'

সুনীল একমুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'বাঃ, ভালোই হয়েছে। তুমি যেদিকে যাবে সেদিকেই লায়লা যাচ্ছে! তোমরা একসঙ্গে যাও, সুবিধে হবে। লায়লাকে সবাই চেনে এখানে। আমার আর দেরি করা উচিত নয়! চলো, তোমাদের ওই মোড় অবধি আমি এগিয়ে দিচ্ছি।' লায়লা আর আমি পাশাপাশি ওর সঙ্গে মোড়ে আসতেই ও হাত নেড়ে বলল, 'কাল সকালে।' বলে ডানদিকের রাস্তা দিয়ে চলে গেল।

লায়লার পায়ের ব্যালান্স ছিল না। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথায় যাবে?' আমি তো নাম জানি না, তাই জবাব দিলাম, 'মিনিট দশেকের রাস্তা।'

'গুড। তাহলে আমার বাড়ি আগেই পড়বে। তুমি একটু ধরো আমাকে। আমি টিপসি হয়ে গেছি। কী যেন নাম তোমার, অতীন? ইজন্ট ইট?'

'হ্যাঁ।' আমাকে ধরতে হল না। লায়লা আমাকে জড়িয়ে ধরল তারপর আমার শরীরের ওপর সমস্ত ভর দিয়ে হাঁটতে লাগল। এভাবে আমার হাঁটা অভ্যাস নেই। তারপর এরকম রাস্তায় এর আগে হাঁটিওনি। ভাগ্যিস রাস্তায় এখন একদম লোক নেই। দোকানপাটও বন্ধ। এই ঠান্ডায় লায়লা একটা স্কার্ট আর জ্যাকেট পরেছে।

আমি বললাম, 'অত ভর দিও না।'

লায়না বলল, 'উম্। তুমি ভার বইতে পারো না? ঠিক আছে, আমাকে জড়িয়ে ধরে হাঁটো। তোমার পক্ষে ইজি হবে। আই অ্যাম রিয়েল টিপসি।'

মনে হল সেইটেই সহজ। আমি ওর পিঠের ওপর একটা হাত দিয়ে ধরে হাঁটতে শুরু করতে ও আর একটা হাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল। একরকম ভঙ্গিতে অচেনা অজানা পুরুষের সঙ্গে হাঁটতে ওর একদম সঙ্কোচ হচ্ছে না। হঠাৎ আমার শরীরের মধ্যে কী রকম করতে লাগল। ওর শরীরের সঙ্গে যতই ঘর্ষণ হচ্ছে ততই এই অনুভূতিটা

বাড়তে লাগল। কান-মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। এরকম আমার কখনই হয়নি। গলা শুকিয়ে গেল! হঠাৎ লায়লা বলল, 'তুমি কাঁপছ কেন?' আমার হাত সত্যি কাঁপছিল এবং তা ঠান্ডায় নয়। আমি কোনও কথা বলতে পারলাম না। ও হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরল, 'ইউ আর বিউটিফুল। আই নেভার হ্যাড ইট উইথ এ বেঙ্গলি। আমি তোমাকে তখন চুমু খেয়েছি তুমি এখন রিটার্ন দাও।'

সেই নির্জন রাত্রে উন্মুক্ত আকাশের তলায় প্রচণ্ড শীতে দাঁড়িয়ে আমি ঘেমে উঠলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম এটা অন্যায়, আমার কিছুতেই এরকম করা উচিত নয়! কিন্তু শরীরে একটুও শক্তি ছিল না। বলতে কী আমার শরীর যে বিদ্রোহ করতে পারে সেই সময় আমি আবিষ্কার করলাম। লায়লার ঠোঁট আমার ঠোঁটের কাছে। উচ্চতায় আমার সমান। ওর নিশ্বাসের হল্কা লাগছে আমার নাকে। জোঁকের মতো ওর ঠোঁট আমার ঠোঁটে আটকে গেল। কতক্ষণ ওই অবস্থায় ছিলাম জানি না। হঠাৎ লায়লার গলা শুনতে পেলাম, 'আমার বাড়ি ওইটে। তুমি ঠিক আধঘণ্টা পরে ডানদিকে জানালায় নক করো, কেমন? উই উইল এনজয় দ্য নাইট। কিন্তু একদম শব্দ করো না। আমার মা একটি হাউন্ড। আধঘণ্টা পরে। গুডবাই!' আমি দেখলাম ও ধীরে-ধীরে নিচে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। পরপর চারটে জানলা বাড়িটার।

হঠাৎ যেন হু-হু করে ঠান্ডা বাতাস আমার শরীরে ঢুকতে লাগল। নিজের অজান্তেই আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'না।' তারপর ছুটতে লাগলাম। খুব নোংরা লাগছিল নিজেকে। চোখের সামনে সুর্মার মুখটা চলে আসতেই ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। এ কী করলাম আমি। আমি সুর্মাকে মুখ দেখাব কী করে! রাস্তার পাশে একটা কল থেকে জল পড়ছিল। একটুও ভ্রূক্ষেপ না করে সেই ঠান্ডা জলে মুখ ধুলাম! ঠোঁট ঘষতে লাগলাম! কনকনে শীতও আমার উপযুক্ত শাস্তি নয়। আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না।

বাড়ির গেট পার হতেই একটা লোক আমার পথ আটকাল, 'কিসকো চাহিয়ে?' সেই বিকেলের দারোয়ানটা নয়, নতুন লোক। আগাগোড়া শীতযন্ত্রে মোড়া এই লোকটাকে কী করে বোঝাই কাকে চাই! বিকেলের ঘটনাটা বললাম। লোকটা হাসল 'নিকাল যাইয়ে হিঁয়াসে, নেহিতো—।' লোকটার একটা হাত কোমরে। সেখানে কুকরি ঝুলছিল।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, 'এ কী বলছ? তোমার মেমসাহেব আমাদের নিয়ে এল—!'

'ফির ঝুট বাৎ, কোই মেমসাব ইয়ে কুঠিমে নেহি রহতা হ্যায়।' প্রায় আমাকে ঠেলে বার করে দিল সে রাস্তায়। আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না। সুর্মা ভেতরে আছে অথচ—! এই রাত্রে আমি কার কাছে সাহায্যের জন্যে যাব? ভীষণ ভয় করতে লাগল আমার! ভাবলাম এখানে দাঁড়িয়ে সুর্মার নাম করে চেচাই। একটু সরে আসতে পাশের বাড়িটার দিকে নজর পড়ল। হুবহু এক রকমের গেট, একই রকমের বাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। আমি ভুল বাড়িতে গিয়েছি! হঠাৎ একধরনের আনন্দে শিহরিত হলাম। এবার আর আমাকে বাধা দিল না। সটান ভেতরে দরজায় পৌঁছে বেল বাজালাম। সেই দারোয়ানটা দরজা খুলে আমায় দেখে সেলাম করল। আমি হলঘরের উত্তাপে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালাম। সুর্মা এখানে নেই। দারোয়ানটা বলল, 'উপরমে যাইয়ে সাব!'

কাঠের রঙিন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে-উঠতে বুঝলাম মহিলা খুব বড়লোক। একটি অল্পবয়সি মেয়ে আমাকে দেখে এগিয়ে এল, 'আইয়ে, ডিনার রেডি।' নিজেকে হঠাৎ নবাব মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমি সুর্মাকে দেখার জন্যে ভেতরে-ভেতরে ছটফট করছিলাম। ওরা সোফায় বসে গল্প করছিল। ওদিকে টেবিলে খাবার সাজানো হচ্ছে। মহিলা আমায় দেখে উঠে দাঁড়ালেন, 'এসো অতীন, সুনীলকে পেলে?'

বুঝলাম সুর্মার সঙ্গে ওর এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি বললাম, 'না! ও দার্জিলিং-এ নেই!'

'বাঃ গুড। আজকের রাতটা তাহলে এখানেই থেকে যাও। এসো, খেয়ে নিই আমরা।'

খাওয়ার টেবিলে বসে আবিষ্কার করলাম আমি সুর্মার মুখের দিকে কিছুতেই তাকাতে পারছি না। একটু আগে লায়লার সঙ্গে যে ঘটনা ঘটল তা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আমরা প্রায় নিঃশব্দেই খেয়ে নিলাম। যা কিছু কথা মহিলার সঙ্গে হচ্ছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর মহিলা বললেন, 'তোমাদের কি ওয়াইন খাওয়ার অভ্যেস আছে?' আমরা দুজনে একসঙ্গে মাথা নাড়ালাম। উনি হেসে সেলার থেকে ওয়াইন গ্লাসে ঢেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে সোফায় ফিরে এলেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড। ঘুম পাচ্ছে?'

সত্যি ক্লান্ত লাগছিল। উনি সেই মেয়েটিকে ডেকে আমাকে ঘর দেখিয়ে দিতে বললেন। আমি উঠে দাঁড়াতে বললেন, 'আমার স্বামীর একটা স্লিপিং গাউন আছে ও ঘরে, চেঞ্জ করে নিও! আর হ্যাঁ, গুডনাইট!'

আমি এবার সুর্মার দিকে তাকালাম। নতুন পোশাকে ওকে বেশ দেখাচ্ছে। আর হঠাৎ আমার শরীরে সেই উত্তাপটা ফিরে এল। আমি কোনওরকমে বললাম, 'কাল খুব ভোরে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে।' তারপর আর দাঁড়ালাম না।

ঘরে এসে নিজের বিছানায় আলো নিভিয়ে শুয়েও আমার ঘুম এল না। লায়লা আমার শরীরে আগুন জ্বেলে গিয়েছে। বারংবার সুর্মার মুখ মনে পড়ছে। সুর্মাকে আমি ভালোবাসি। অমরা এক বাড়িতে আছি অথচ—। আমার খুব ইচ্ছে করছিল সুর্মাকে চুমু খেতে। কিন্তু ওই মহিলা, সুর্মা মহিলাকে কতটুকু বলেছে কে জানে! সুর্মাকে কোন ঘরে শুতে দিতে পারে আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম! ওপরে তো তিনটে শোওয়ার ঘর লক্ষ করেছি। নিশ্চয়ই পরেরটা। মাঝখানে একটা দরজা আছে এবং সেটা ভারী পর্দাতে ঢাকা। দরজাটা কি খোলা? আমি বিছানায় উঠে বসলাম। আমার কিছুতেই ঘুম আসছে না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক আমি নিঃশব্দে বসে থাকলাম। সুর্মাকে এবার দেখার বাসনা তীব্র হয়ে উঠেছে। পা টিপে-টিপে পর্দাটা সরালাম। সামান্য চাপ দিয়ে বুঝলাম দরজাটা ওপাশ থেকে বন্ধ। এটা কি কখনও খোলা হয় না। ভাবলাম বাথরুমে গিয়ে মুখে জল দিলে ঘুম আসবে। ঝকঝকে বাথরুমে ঢুকে নীলচে আলো জ্বালাতেই নজরে পড়ল ওপাশে আর-একটা দরজা আছে। দুটো ঘরের জন্য কমন বাথরুম? খুব সন্তর্পণে ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। আমি চোরের মতো অন্য ঘরটিতে প্রবেশ করলাম। কোনও আলো জ্বলছে না। অন্ধকারে নিজের চোখকে অভ্যস্ত করতে কিছু সময়

নিলাম। ঘরের ঠিক ডানদিকে একটা খাট আর তাতে গলা অবধি কম্বল ঢাকা দিয়ে কেউ শুয়ে আছে। এগিয়ে যেতেই চমকে উঠলাম। খাটের ওপাশে কাঠের মেঝেতে বিছানা করে আর একজন শুয়ে। অনুমানে বুঝলাম সেই মেয়েটি নিশ্চয়ই সুর্মা। কিন্তু সুর্মা না হয়ে যদি ওই মহিলা হন, বুকে কাঁপুনি এল। এই ঘরে রাত্রে ওর কাছে ধরা পড়লে কী পরিণতি হবে বলা মুশকিল। তবু আমি শেষবার খাটে শোওয়া শরীরটির মুখ দেখতে চাইলাম। অন্ধকার মানুষের মুখকে এত আড়ালে রাখে কেন? আমি আবার নিঃশব্দে আমার ঘরে ফিরে এসে বিছানায় আছড়ে পড়লাম।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেনটা বেশি দেরিতেই পৌঁছেছিল। স্বপ্নেন্দু সুর্মার মাকে নিয়ে একটা ট্যাক্সি করলেন। বললেন, 'ভাই খুব বিপদে পড়ে এসেছি কার্শিয়াং-এ পৌঁছে দিন।'

ড্রাইভার নেপালি হলেও পরিষ্কার বাংলা বোঝে এবং বেশ বয়স্ক বলেই বিপদের কথা শুনে একটু সচকিত হল। গাড়ি চালু করে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেউ হাসপাতালে আছে?'

'না ভাই। আমার কলেজে পড়া মেয়েকে ওই বয়সি ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে গতকাল। আমরা তাকে খুঁজতে যাচ্ছি।' স্বপ্নেন্দু বললেন।

অন্যসময় হলে চট করে কাউকে এরকম কথা তিনি বলতে পারতেন না। কিন্তু এখন বলে-বলে এই বলাটা তাঁর কাছে সহজ হয়ে গিয়েছে।

ড্রাইভার বলল, 'পুলিশে খবর দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ ড্রাইভারের কিছু মনে পড়ল। সে সামনের কাচে চোখ রেখে শুধোল, 'আপনার মেয়ে কি প্যান্ট পরে? সুন্দরী?'

সুর্মার মা এতক্ষণ এদের কথা শুনছিলেন এবার সোৎসাহে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও প্যান্ট-শার্ট পরেই এসেছিল। আপনি দেখেছেন?'

ড্রাইভার বলল, 'ছেলেটি ওর চেয়ে অল্পবয়সি? মুখে দাড়ি আছে?'

স্বপ্নেন্দু বললেন, 'না অল্পবয়সি নয়, তবে দাড়ি আছে। ঠিকই দেখেছেন আপনি। ও ভগবান! যাক তাহলে আমরা ভুল জায়গায় যাচ্ছি না। ভাই, ওদের আপনি কোথায় দেখেছেন?'

ড্রাইভার জানাল, কাল বিকেলে সে যখন কার্শিয়াং যাচ্ছিল তখন ওই দুটি ছেলেমেয়ে হাত তুলে তার গাড়ি থামাতে চেয়েছিল। ওরকম সাধারণ পাহাড়ি গাঁয়ে এইরকম চেহারার বাঙালি ছেলেমেয়ে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সঙ্গে যাত্রী থাকায় সে আর থামেনি। এই ছেলেমেয়ে দুটিকে ফেরার পথে কিন্তু চোখে পড়েনি। তার মানে ওরা গাড়ি পেয়ে গিয়েছিল।

স্বপ্নেন্দু উৎসাহ পেলেন। মেয়েকে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেনই।

পাহাড়ে যখন গাড়িটা উঠছিল তখন স্বপ্নেন্দুর মন খারাপ হয়ে গেল। অনেক জায়গায় সুর্মাকে নিয়ে তিনি বেড়াতে গিয়েছেন, কিন্তু এই দার্জিলিংটা হয়ে ওঠেনি। সেই এলেন, কীভাবে এলেন? গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে ভাবছিলেন, দুটো রাত কেটে গেল।

কীরকম আছে সুর্মা কে জানে!

কার্শিয়াং পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিলেন না স্বপ্নেন্দু। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে অফিসারের সঙ্গে দেখা করলেন। অফিসার ইন চার্জ বাঙালি, রিটায়ার্ড হতে আর বেশি দেরি নেই। স্বপ্নেন্দু ওঁর সমস্যার কথা বলতে ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ তারা তো কার্শিয়াং আসেনি।'

'আপনি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত?'

'সিওর। এখানাকার সব হোটেলে সার্চ করেছি। গতকাল অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে পেলেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। তাই নিয়ে কী ঝামেলাটাই না হল। উফ্। না, কার্শিয়াং-এ আপনার মেয়ে আসেনি।'

'সুনীল, সুনীল প্রধানের বাড়িতে—।'

অফিসার বললেন, 'সুনীল দার্জিলিং-এর হোস্টেলে। কাল বিকেলে খোঁজ নেওয়া হয়ে গিয়েছে। না মশাই, আমার মনে হচ্ছে আপনার মেয়ে এদিকে মোটেই আসেনি। এলে স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড এবং এই কার্শিয়াং-এর বাস স্টপেজে ধরা পড়ে যেতই। আজকালকার ছেলেমেয়েরা বড্ড ব্লাফ দেয়।'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়লেন, 'না, ওরা এদিকেই এসেছে। আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভার গতকাল ওদের দেখেছে হাত নেড়ে লিফট চাইতে। আমি একবার সুনীলের বাড়িতে যেতে চাই। কীভাবে যাব?'

অফিসার খুব জোরে মাথা নাড়লেন, 'সে চেষ্টা একদম করবেন না। খুব ডেঞ্জারাস এলাকায় ওদের বাড়ি। আমি ফোর্স না নিয়ে যাই না। ওর বাবার খুব পয়সা আছে, কিন্তু এই শহরের এক নম্বর কুখ্যাত লোক, খুনজখম ওই বস্তিতে লেগেই আছে। আপনি বরং এক কাজ করুন, সোজা দার্জিলিং-এ গিয়ে সুনীলের সঙ্গে দেখা করুন।'

স্টেশনের পাশে একটি হিন্দুস্থানীর দোকান থেকে ওরা সকালের চা খেলেন। তারপর ট্যাক্সিতে ফিরে গিয়ে বললেন, 'দার্জিলিং-এ যেতে হবে।' লোকটা সম্মতি জানাল। সুর্মার মাকে গাড়িতে বসিয়ে দুটো পান কিনে দিয়ে স্বপ্নেন্দু যখন ফিরছেন তখন উল্টোদিকে একটা শাট্‌ল জিপ থেকে ওরা নামল। অতীন পানের দোকানের ওপর ইংরেজিতে পানবাহার কথাটা লক্ষ করে সুর্মাকে দাঁড়াতে বলে এগিয়ে এল। আর তখনই স্বপ্নেন্দু ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করে স্ত্রীর হাতে পান দিলেন। ট্যাক্সিতে বসে ঘাড় ঘোরালেই মেয়েকে দেখতে পেতেন কিংবা সুর্মা চলে যাওয়া ট্যাক্সিটার দিকে আর-একটু আগে তাকালেই বাবাকে দেখতে পেত। দুজনের কেউ জানল না, জানতে পারল না।

অতীন সুনীল প্রধানের নাম বলতেই পানের দোকানের লোকটা একটা ছোকরাকে ডাকল, 'এ কাঞ্চা, এত্তা আও।'

ছোকরা যেন নির্দেশিত ছিল। সে অতীনকে বলল, 'চলিয়ে।' অতীন সুর্মাকে ইশারায় ডেকে ওর সঙ্গে চলতে শুরু করল। দার্জিলিং থেকে এসে এই জায়গাটাকে তেমন পছন্দ হচ্ছিল না সুর্মার। অবশ্য দার্জিলিং-এর কিছুই সে দেখতে পায়নি। তবু জিনা দোরজির জন্যে দার্জিলিংটাকে ওর বেশ পছন্দ হচ্ছিল। আজ ভোরে ঘুম ভেঙে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে যখন আকাশের দিকে তাকিয়েছিল তখন সেদিকটা ছিল ঘোলাটে আচ্ছন্ন। তারপর

হঠাৎ একটা লালচে সোনার মুকুট উঁকি দিল কুয়াশা ফুঁড়ে। তখনি চট করে সরে যেতে লাগল কুয়াশারা, আর ঝকমকিয়ে উঠল কাঞ্চনজঙ্ঘা। সুর্মা এক অনির্বচনীয় আনন্দে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক সেই সময় পেছনে হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে দেখল জিনা পেছনে দাঁড়িয়ে। হেসে বলল, 'ওই দিকে তাকালে পৃথিবীর সব অহঙ্কার ভেঙে যায় তাই না? কেমন ঘুম হয়েছে?'

ঘাড় কাৎ করে সুর্মা বলেছিল, 'ভাল।'

'আজ তো তোমরা কার্শিয়াং-এ চলে যাবে?'

সুর্মা মাথা নাড়ল। কী বলবে সে!

'শোনো, এভাবে পালিয়ে থেকে জীবনে সুখী হওয়া যায় না। যা সত্যি তার মুখোমুখি হওয়া সবচেয়ে ভালো। তুমি যদি চাও আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি! তোমাদের কলকাতার বাড়িতে টেলিফোন আছে?'

সুর্মা মাথা নেড়ে না বলল।

'ভেবে দ্যাখো, তুমি চাইলে আমি পুলিশকে খবর দিতে পারি যাতে তোমার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে।'

'কিন্তু—?' অতীনের মুখ মনে পড়ল সুর্মার। বাবা কি কখনও তাকে ক্ষমা করবেন? করলেও অতীনকে মেনে নেবেন? সে যতদূর জানে কখনও তা সম্ভব নয়। সে মাথা নাড়ল, না। আর অতীনকে ছেড়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। এখন যা হোক তা একসঙ্গেই হবে। জিনা দোরজি হেসেছিল, 'জীবনটা কখনই অ্যাডভেঞ্চার নয়। আমার উচিত ছিল তোমাদের এইভাবে ছেড়ে না দেওয়া, কিন্তু তোমরা যখন নিজেই চাইছ। যা হোক, দার্জিলিং-এর কাছাকাছি থেকে যদি বিপদে পড় তাহলে সোজা আমার কাছে চলে এসো।'

কার্শিয়াং-এ আসার পথে সুর্মা ভাবছিল কেন জিনা দোরজি তাদের পুলিশে না ধরিয়ে দিয়ে অমন যত্ন-আত্তি করল? কিছুতেই একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তৈরি করতে পারল না সে।

কিন্তু এখন অতীনের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে ওর ক্রমশ ভালো লাগছিল। বেশ উত্তেজনা আছে এইভাবে পালিয়ে বেড়ানোর মধ্যে। বিদেশি বইতেই শুধু এইরকম অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পাওয়া যায়।

বড় রাস্তা থেকে অনেকটা নিচে নেমে এল ওরা। খুব গরিব এলাকা দিয়ে কিছুটা হাঁটার পর ছেলেটা বলল, 'আ গিয়া।'

খুব সাধারণ একটা কাঠের বাড়ির বারান্দায় সুনীল দাঁড়িয়েছিল। ওদের দেখে নেমে এল সহাস্যে, 'হ্যালো, গুড মর্নিং।'

অতীন হাসল। তারপর সুনীলের প্রসারিত হাতে হাত রাখল, 'তোমার বাড়ি?' সুনীল মাথা নাড়ল, 'ইয়েস। তোমার গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও!' অতীন তাড়াতাড়ি সুর্মাকে বলল, 'এই হল সুনীল, তুই তো নাম জানিস। আর এই হল সুর্মা।'

'সুর্মা! বাঃ দারুণ নাম! অতীন ইউ আর লাকিয়েস্ট ম্যান অফ ওয়ার্ল্ড। আপনি খুব সুন্দরী, রিয়েলি।' সুনীল হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়ালে সুর্মা কী করবে বুঝতে

পারল না। এইভাবে তাকে কখনও সামনাসামনি কেউ রূপের প্রশংসা করেনি। সে কোনওরকমে হাত ছুঁইয়ে নামিয়ে নিল।

সুনীল বলল, 'নাউ, লেট্স মুভ। আমার বাড়িতে পুলিশ আসতে পারে তাই তোমাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করেছি।' ছোকরাটিকে বিদায় করে সে ওদের নিয়ে চলল। সুর্মা লক্ষ করল সুনীল খুব সেজেছে। জিন্স-এর প্যান্টটা এত চাপা যেন ওর শরীর আঁকড়ে আছে। ভালো করে তাকাতে লজ্জা করল সুর্মার। ওপরে একটা চামড়ার জ্যাকেট, মাথায় কায়দা করা টুপিতে খুব স্মার্ট লাগছে ছেলেটাকে। কিন্তু প্রথমবার দেখেই সুর্মার ওকে পছন্দ হয়নি। ছেলেটার চাহনির মধ্যে এমন কিছু আছে যা অতীনের নেই। ছেলেটিকে ঈশ্বর সরলতা দেননি।

সুনীল দুঘরের একটা বাড়িতে ওদের তুলল। একজন বুড়ি নেপালি মহিলা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল, সুনীল তাকে বলল, 'দিদি এরা আমার বন্ধু, তোমার কাছে কদিন থাকবে।'

বুড়ি পেতলে বাঁধানো দাঁত দেখিয়ে হাসল। ঘরে ঢুকে সুর্মা দেখল একটা খাটের ওপর পাতলা তোষক, চাদর আর টেবিল ছাড়া আর কোনও সরঞ্জাম নেই। সুনীল বুড়িকে বলল, 'কম্বল ছইনা?'

'ছ।'

সুনীল বলল, 'পাশেই বাথরুম আছে। দিদি তোমাদের খাবার তৈরি করে দেবে। ওকে রোজ বিশ টাকা দিতে হবে। তোমার কাছে টাকা আছে অতীন?'

অতীন বলল, 'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। আমি এখন যাচ্ছি, তোমরা ঘর থেকে বেশি বেরিয়ো না। যত কম লোকে তোমাদের দেখে তত ভালো। আই হোপ য়ু উইল লাইক টু স্টে ইন দিস কোজি রুম! বাই।' সুনীল একটা চোখ টিপে চলে গেল।

দার্জিলিং থানার অফিসার ইনচার্জ-এর বক্তব্য শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন স্বপ্নেন্দু। না, সুর্মারা এখানেও আসেনি। প্রতিটি হোটেল চেক করা হয়েছে কিন্তু ওদের পাওয়া যায়নি। এবং সুনীল প্রধানকে কাল বিকেলের পর ওর হোস্টেলে পাওয়া যাচ্ছে না। স্বপ্নেন্দু কী করবেন প্রথমে ভেবে পেলেন না। তিনি অফিসারকে ট্যাক্সি ড্রাইভার যা দেখেছিল তাই বললেন। শুনে ভদ্রলোকের কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি বললেন, 'আমার সঙ্গে চলুন আপনারা। উই শুড ফাইন্ড হিম ফার্স্ট। ছেলেটির মোটেই সুনাম নেই। আপনার মিসেস ইচ্ছে করলে এখানে অপেক্ষা করতে পারেন।'

কিন্তু সুর্মার মা বেঁকে বসলেন, 'না, আমিও যাব।'

অফিসারের সঙ্গে হেঁটে ওরা হোস্টেলে এলেন। সুনীলের রুমমেট কিছুই বলতে পারল না। অনেক প্রশ্ন করে ক্লান্ত হয়ে ওঁরা যখন বেরিয়ে আসছেন তখন স্বপ্নেন্দু দারোয়ানকে দেখতে পেলেন। তিনি দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা ভাই, সুনীল কোথায় গিয়েছে জানো?'

'নেহি সাব।'

অফিসার প্রশ্ন করলেন, 'কাল কোথায় গিয়েছিল?'

'শায়েদ থ্রু বয় রেস্টুরেন্টে। ওহি জায়গাতে ডেইলি যাতা থা।'

স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল ওকে কেউ খুঁজতে এসেছিল?'

'পুলিশ আয়া থা রাতমে।'

'আর কেউ?'

'হ্যাঁ সাব। এক বাঙালি লেড়কা আয়া থা সাত বাজে।'

অফিসার সচকিত হলেন, 'বাঙালি? কীরকম দেখতে?'

'থোড়াসা দাড়ি হ্যায়।'

স্বপ্নেন্দু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অতীন। নিশ্চয়ই অতীন।'

দারোয়ানের কথামতো ওরা ব্লুবয়-তে উপস্থিত হল। এখন বার একদম ফাঁকা। পুলিশ অফিসারকে দেখে ম্যানেজার এগিয়ে এল, 'ইয়েস স্যার?'

'আপনার এখানে রোজ সন্ধেবেলায় সুনীল প্রধান আসে?'

ম্যানেজার একটু ইতস্তত করে বলল, 'ইয়েস।'

'গতকাল এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ওর টেবিলে কোন বেয়ারা ছিল?'

বেয়ারাকে ডেকে আনা হলে সে জানাল সুনীল তার চার বন্ধু-বান্ধবীকে নিয়ে বিকেল থেকে এখানে বসে ড্রিঙ্ক করেছে। হ্যাঁ, একজন বাঙালি ছেলে ওর খোঁজে এসেছিল। তার মুখে দাড়ি আছে। তাকে মনে আছে যে সুনীল প্রধানের এক বান্ধবী তার ড্রিঙ্কস নিয়ে চুমু ছুঁড়ে দিয়েছিল। স্বপ্নেন্দু অবাক হলেন। অতীনকে অপরিচিত মেয়ে চুমু খাচ্ছে? কী কাণ্ড।

বেয়ারা তারপর আর ওদের লক্ষ করেনি বলে জানাল। অফিসার মেয়েটির নাম জেনে হেসে ফেললেন, 'সি ইজ হেডেক অফ হার ফ্যামিলি। দার্জিলিং-এর ছেলেদের নষ্ট করছে। কুড়ি বছর বয়সেই কতবার যে প্রেমিক চেঞ্জ করল কে জানে। ওকে চাপ দিলে মনে হয় কিছু খবর পাওয়া যাবে।'

লায়লাকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। স্বপ্নেন্দু দেখলেন মেয়েটির শরীরে যৌবন যেন বিপর্যস্ত। একটা হালকা হাউসকোট পরে আছে। ওর মা কড়াগলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী দরকার আমার মেয়ের সঙ্গে?'

'আমি ওকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। সুনীল প্রধান কোথায়?'

লায়লা হাসল, 'আই ডোন্ট নো। কাল রাত্রে আমাদের ছেড়ে ও একা চলে গেছে। আপনারা তো সন্ধে থেকে ওর পেছনে লেগেছেন!'

'আচ্ছা, তুমি জানো?'

'ইয়া। সেটা শুনেই ও ছেলেটাকে নিয়ে ব্লু-বয় থেকে পালিয়েছিল। অবশ্য কিছুক্ষণ বাদেই রাস্তায় আমাদের দেখা হয়েছিল। হি ইজ হিরো।'

'হুম, ছেলেটা কোথায়?'

'দ্যাট বেঙ্গলি বয়? বোনলেস ক্রিয়েচার! আমার সঙ্গে এই বাড়ি অবধি এগিয়ে গেল। আশেপাশের কোনও বাড়িতে উঠেছে সে।'

'তুমি ঠিক বলছ? দাড়িওয়ালা বাঙালি ছেলে?'

'ইয়া। আই অ্যাম স্টিল ফিলিং হিজ বিয়ার্ড। বাট হি ইজ নট এ ম্যান।'

ঠোঁট বেঁকাল লায়লা। আর সঙ্গে-সঙ্গে ওর মা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওঃ লায়লা, শাট আপ!'

রাস্তায় নেমে অফিসার বললেন, 'মিস্টিরিয়াস। ওরা এখানে কার বাড়িতে উঠতে পারে? চেনাশোনা হল কী করে?'

ভদ্রলোক স্বপ্নেন্দুদের নিয়ে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। অনেকগুলো বাড়ির পর একটা দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। হ্যাঁ, এই বর্ণনায় একটি ছেলে অনেক রাত্রে বাড়িতে ঢুকতে চেয়েছিল। কিন্তু সে তাকে ঢুকতে দেয়নি। কারণ ছেলেটি একজন মেমসাহেবের খোঁজ নিচ্ছিল আর বলছিল তার কাছে ছেলেটির আত্মীয়রা আছে। তাড়া খেয়ে ছেলেটির পাশের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। পাশের বাড়িতে নক করে পুলিশ অফিসার বললেন, 'এখানে কী করে আসবে বুঝতে পারছি না। মিসেস দোরজি খুব রেসপেক্টেবল মহিলা।'

মিসেস দোরজি নিজেই নেমে এলেন, 'ইয়েস অফিসার।'

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। গতকাল আপনার এখানে দুটো অল্পবয়সি বাঙালি ছেলেমেয়ে এসেছিল?'

জিনা স্বপ্নেন্দু এবং সুর্মার মাকে দেখলেন, 'হ্যাঁ, এসেছিল।'

স্বপ্নেন্দু উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করলেন, 'এসেছিল! তারা আছে?'

মাথা নাড়লেন জিনা, 'না। তারা আজই কার্শিয়াং চলে গেছে।'

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার্শিয়াং-এ কোথায়?'

'আই ডোন্ট নো। কাল বাগডোগরা থেকে ফেরার পথে ওরা আমার কাছে লিফট চাইল। রাত হয়ে গেছে এবং ওরা নিউকামার বলে আমার একটু সফ্‌ট হতে ইচ্ছে করল। ছেলেটি যার ওপর ডিপেন্ড করেছিল তাকে এখানে পায়নি। ফলে আমার এখানে শেল্টার নিয়েছিল ওরা। আজ সকালে ওরা চলে গেছে। হোয়াই, এনিথিং রং?' মিসেস দোরজি জিজ্ঞাসা করলেন!

'হ্যাঁ। ওরা পালিয়ে এসেছে। এঁরা হলেন মেয়েটির মা-বাবা। ওই ছেলেটি সুস্থ নয়। অনেক ধন্যবাদ।' অফিসার উঠে দাঁড়ালেন।

'এক মিনিট!' জিনা এগিয়ে এলেন সুর্মার মায়ের কাছে, 'আমি আপনার কষ্ট বুঝতে পারছি। আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। শি ইজ গুড গার্ল। কী নরম। এটুকু বলতে পারি এখনও অবধি সে ভালো আছে।'

সুর্মার মা হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। স্বপ্নেন্দু নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলেন, 'যে মেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তার জন্য কাঁদছ কেন? চলো।'

মিসেস দোরজি বললেন, 'অফিসার, মে আই গিভ ইউ লিফট?'

'আপনি বেরুবেন?'

'হ্যাঁ।'

ওঁরা মিসেস দোরজির গাড়িতে থানায় ফিরে এলেন। এখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। সারাদিন ওঁদের খাওয়া হয়নি। কিন্তু সামান্য ক্ষুধা বোধ করছিলেন না। অফিসারের ধারণা ওরা সুনীলের কাছেই গিয়েছে। সুনীলকে অ্যারেস্ট করে আনতে হবে। এস. পি-র কাছ থেকে ফোর্স নিয়ে যাওয়ার অর্ডারটা আনতে সামান্য দেরি

হবে। ওদের কোনও রেস্টুরেন্টে খেয়ে নিয়ে নিতে বললেন অফিসার। জিনা আর অপেক্ষা করেননি, উনি বুঝতে পারছিলেন কাজটা ঠিক হয়নি। সুনীল মোটেই ভালো ছেলে নয়! তবু ওর কথা এঁদের বলতে পারলেন না। এই টিন-অ্যাডভেঞ্চারটা তিনি কেন জানেন না পছন্দ করে ফেলেছেন। নিজের মেয়ে হলে নিশ্চয়ই বাধা দিতেন, কিন্তু নিজে ওই বয়সে এমন ভেসে পড়তে পারলে হয়তো খুশি হতেন। এই চল্লিশ বছর বয়সে কাউকে বিয়ে করতে যে দ্বিধা আসছে তার ছেলেমেয়েদুটোর তা নেই। নিজের ইচ্ছেটা গোপনে-গোপনে ওদের মধ্যে কি দেখতে পেয়েছেন তিনি? সুর্মার মাকে দেখে তাঁর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল তাই পালিয়ে বাঁচলেন। কাজ আছে বলে বিদায় নিয়েছেন। খুব তাড়াতাড়ি দুপুরটা ফুরিয়ে আসছিল দার্জিলিং-এ।

একটু আগে ভাত আর মাংসের ঝোল খেয়েছি আমরা। রান্নাটা মোটেই ভালো নয়। অতীন দেখলাম খুব খেল। আমি সামান্য। খাওয়া-দাওয়ার পর অতীন খাটে শুয়ে পড়লে আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ খেয়াল হল, এই ঘরে আমাকে অতীনের সঙ্গে থাকতে হবে। সঙ্গে-সঙ্গে খুব অস্বস্তি হল, সেই সঙ্গে লজ্জা। আমাদের মধ্যে এমন কোনও সম্পর্ক এখনও গড়ে ওঠেনি যে এভাবে থাকা যায়। স্বামী-স্ত্রী ছাড়া কেউ এরকম থাকে? আমি যদি পাশের ঘরে বুড়ির সঙ্গে থাকি? এই সময় অতীন আমাকে ডাকল, 'এই, তুই কী ভাবছিস?'

'কিছু না।' আমি টেবিলের ওপর পড়ে থাকা একটা ভারী লোহার রড স্পর্শ করলাম।

'দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এখানে আয়।'

'কেন?'

'বারে। ওইভাবে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকবি?'

'আমি তোর সঙ্গে একঘরে থাকতে পারব না!' কথাটা বলেই ফেললাম।

'কেন?' অতীন উঠে বসল।

'বাঃ। থাকা যায়?'

'কেন? থাকা যায় না কেন?'

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। ও কি কিছু বোঝে না? না কোনও ফন্দি করে এই কথা বলছে! বললাম, 'যায় না তাই।'

অতীন নেমে এল। এসে আমার কাঁধে হাত রাখল, 'এই সুর্মি, তুই আমাকে একটুও ভালোবাসিস না? আমি তোর জন্যে প্রাণ দিতে পারি!'

কথাটা শোনামাত্র আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম। ও হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরল, 'এই কী হয়েছে তোর? কাঁপছিস কেন?'

আমি বললাম, 'ছেড়ে দে, আঃ।'

ও বলল, 'না ছাড়ব না। আমি তোকে ভালোবাসি, তাই এভাবে বুকে জড়িয়ে ধরব।' ও আমাকে ছাড়ছিল না, কিন্তু বুঝলাম ও হাঁপাচ্ছে। আমি প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু অতীনের গায়ের জোর যেন অনেক গুণ বেড়ে গেছে। আমরা সারা ঘরে যেন লড়াই করতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম অতীনের

মুখ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, নিশ্বাস গরম। শেষ পর্যন্ত আমরা খাটের ওপর আছড়ে পড়লাম। আমার পিঠে খুব ব্যথা করল আর আমি হেরে গেলাম। অতীন তখনি আমার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট রাখল। এই প্রথম কোনও পুরুষ আমাকে চুম্বন করল। অতীন পাগলের মতো আমাকে চুমু খেয়ে যাচ্ছে, ঠোঁটে, গালে, চোখে, গলায়। আমি স্থির হয়ে পড়ে আছি। এবং এই সময় আমার কান্না পেতে লাগল। হঠাৎ অতীন চুমু খাওয়া থামিয়ে বলল, 'সুর্মি, তুই আমাকে চুমু খা। একটু চুমু, প্লিজ। তোকে আমি কী ভীষণ ভালোবাসি!' ও আমার কাছে ভিক্ষে চাওয়ার মতো বলতে লাগল। তারপরেই ওর চোখ পড়ল আমার চোখে। দেখলাম অতীনের ঠোঁট নেমে আসছে। দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে পরম যত্নে ও ঠোঁট দিয়ে আমার চোখের জল শুষে নিল। তারপর আমার গলায় মুখ রেখে পড়ে রইল। কী হল জানি না, এই প্রথম আমি ওকে অস্বীকার করতে পারলাম না। অজান্তেই ওর মাথায় আমার ডান হাতে উঠে এল। আমি চুপচাপ সেই অবস্থায় ওর চুলে বিলি কাটতে লাগলাম। এবং এই প্রথম আমি, কেমন করে জানি না, অতীনকে ভালোবেসে ফেললাম।

এই ঘরে ইলেকট্রিক আলো নেই। আমার পাশে শুয়ে অতীন বলল, 'আজ থেকে তুই আমার বউ। আমার হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা কর কোনও অবস্থায় আমাকে ছেড়ে যাবি না।'

আমি ওর হাতে হাত রেখে হাসলাম, 'ঠিক আছে।'

'না ঠিক আছে বললে চলবে না। পুরোটা বল।'

আমি হাসলাম, 'তুই ভীষণ ছেলেমানুষ।'

ওর দুই চোখ তৃপ্তিতে ভরে গেল। আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল আমার পাশে। এখন ঘরে বেশ ঘন ছায়া। সারাটা দুপুর ও আমাকে আদর করেছে। কিন্তু মেয়ে বলে আমি যে কারণে সিঁটিয়ে ছিলাম ও তার ধার দিয়েই গেল না। শুধু চুমু আর স্পর্শেই ওর শান্তি। মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিল ও মোটেই বড় হয়নি। আমার চেয়ে অনেক কম বোঝে। তাই বোধহয় স্বস্তিতে ছিলাম। ক্রমশ আমার মনে হতে লাগল আমি যা বলব ও তাই করবে। একধরনের নিরাপত্তা বোধ এল এই অহঙ্কার থেকে।

এই সময় দরজায় কেউ শব্দ করল। অতীন ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে রে?'

'বুড়িটা হতে পারে! দ্যাখ না।'

অতীন উঠে দরজা খুলল। একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, 'আপকো বোলাতা হ্যায়।'

'কৌন?'

'সুনীল।'

আমি খাটে উঠে বসেছিলাম, অতীন বলল, 'কী ব্যাপার কে জানে। তুই ঘরে থাক আমি ঘুরে আসছি।'

'তাড়াতাড়ি আসিস।'

অতীন আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর ছেলেটার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। আমি উঠলাম। অন্যমনস্কভাবে চুলে হাত দিতে গিয়ে মনে পড়ল আমার চিরুনি নেই। অতীনকে

বলতে হবে কয়েকটা জিনিস কিনতে। আমার আর-একটা পোশাক দরকার। এই শার্ট-প্যান্টে কতদিন থাকা যায়!

আমার আজ বেশ ভালো লাগছিল। আমার ভেতরে যে আর-একটা আমি আছে তা আজ প্রথম টের পেলাম। অতীনটা সত্যি ছেলেমানুষ। সত্যি।

বাইরে কারও জুতোর শব্দ হল। তাকিয়ে দেখলাম সুনীল দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মিস্টার কোথায়?

কথাটা আমার একটুও ভালো লাগল না। তবু জবাব দিলাম, 'আপনার কাছে গেল। একটা ছেলে ডাকতে এসেছিল।'

'কিন্তু আমি অপেক্ষা করে চলে এলাম! তোমাদের আগে ডিস্টার্ব করতে চাইনি। সারাটা দুপুর কেমন এনজয় করলে?'

আমার মাথা গরম হয়ে গেল। আমি কী বলব ওকে? অতীন এখনও আসছে না কেন? সুনীল ভেতরে ঢুকল, 'তুমি দারুণ দেখতে। অতীনকে আমি একটা চাকরি জুটিয়ে দেব। কিন্তু তোমাকে আমার অন্য কাজে দরকার হবে।'

'কী কাজ?'

'নট সো কুইক। ইউ ডোন্ট লাভ হিম, ইজন্ট ইট? তোমাকে একবার দেখেই বুঝতে পেরেছি অতীন তোমাকে জোর করে নিয়ে এসেছে।' ও হাসল, 'আমাকে তোমার কেমন লাগছে?' সুনীল আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। আমার খুব ভয় করল। ওর মতলব যে ভালো নয় তা বুঝতে পারছি।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আপনি এগিয়ে আসছেন কেন?'

'টু সেভ ইউ ফ্রম পুলিশ। একটা চুমু খাও তো আমাকে। দেখি ওটা মিষ্টি না নোনতা? মাইন্ড ইট, এই কথা অতীনকে বললে আমি তোমাদের পুলিশে ধরিয়ে দেব।' ও চোখ বন্ধ করে আমার দিকে মুখ বাড়িয়ে দিল।

রাগে আমার মাথা ঘুরে গেল। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা লোহার রডটা তুলে প্রাণপণে ওর মাথায় আঘাত করতেই সুনীলের দুটো চোখে অবাক বিস্ময়ে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। আমি দেখলাম ওর শরীরটা যেন খসে পড়ল মাটিতে আর মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল! আমি চিৎকার করতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপরে অতীনের ব্যাগটা তুলে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। বুড়িকে চোখে পড়ল না, আর তখনই অতীনকে দেখতে পেলাম। দ্রুত ফিরে আসছে। আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস?' আমি কথা বলতে পারছিলাম না। দ্রুত ওর হাতে ধরে নিশ্বাস নিলাম। 'তাড়াতাড়ি চল।'

'কোথায়?'

'এখান থেকে পালিয়ে যাব। প্লিজ, পরে কথা হবে।'

'কিন্তু সুনীলকে পেলাম না। ওর সঙ্গে দেখা না করে চলে যাব কেন?'

'পরে, পরে কথা বলব।' আমি ওকে নিয়ে প্রায় দৌড়াচ্ছিলাম। অতীন নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছিল। বস্তিটা পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে আমরা গাড়ির শব্দ পেলাম। খুব জোরে আসছে। আমার কী মনে হল জানি না, তাড়াতাড়ি একটা গাছের আড়ালে অতীনকে টেনে নিয়ে দাঁড়ালাম। এখন সন্ধের অন্ধকার নেমে আসছে। পুলিশের দুটো

জিপকে ছুটে যেতে দেখলাম। অতীন ফিসফিসিয়ে বলল, 'ওরা আমাদের জন্যে আসছে নিশ্চয়ই।'

গাড়িদুটো চোখের আড়ালে যেতেই আমরা ছুটতে লাগলাম। রাস্তার লোকজন অবাক হয়ে আমাদের দেখছে। স্টেশনের কাছে এসে অতীন বলল, 'কী করবি? কোথায় যাবি?'

আমি বললাম, 'জানি না।'

সেইসময় একটা ট্রেন স্টেশন থেকে হুইসেল দিতে-দিতে বের হল। ছোট ট্রেনটা আমাদের সামনে দিয়ে এগোচ্ছে। আমরা আর কোনও চিন্তা না করে দৌড়ে ওই ধীরে চলা ট্রেনটায় উঠে পড়লাম।

সুনীলের বাবা পুলিশের কাছে সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। না, এরকম কোনও বাঙালি ছেলেমেয়ে আজ তাদের কাছে আসেনি। পুলিশ তন্নতন্ন করে খুঁজল। অনেককে জেরা করল। স্বপ্নেন্দু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলেন। অফিসার বলছিলেন, 'মুশকিল কী জানেন, এরা একজন যে কথা বলে আর কেউ তার উলটো বলতে পারে না কিছুতেই। সত্যি কথাটা এদের মুখ থেকে বের করা যায় না।' স্বপ্নেন্দু ভাবছিলেন সুর্মা কী করে এইরকম পরিবেশে আসবে? মেয়েটার এত বছরের সংস্কার, অভ্যাস একদিনেই পালটে গেল।

সন্ধে সাতটা নাগাদ পুলিশ চলে গেলে সুনীলের বাবা খবরটা পেলেন। সেই বুড়ি, একটু আগে সুনীলকে আবিষ্কার করেও পুলিশের ভয়ে কিছু বলেনি। তার ফলে বেশ দেরি হয়ে গেছে। সুনীলকে বাঁচানো গেল না।

মৃতদেহ সামনে নিয়ে সুনীলের বাবা কিছুক্ষণ বসে থাকল। তার 'বিন্দুমাত্র সন্দেহ' ছিল না ওই ছেলেমেয়ে দুটো এই হত্যার জন্য দায়ী। কিন্তু এই কথা এখন পুলিশকে জানানো যাবে না। যাদের অস্তিত্বের কথা সে নিজে অস্বীকার করেছে তারাই যে ছেলেকে খুন করতে পারে এখন আর বলা যায় না। সে আটজন বিশ্বাসী লোককে ডাকল। তাদের ওপর দায়িত্ব দিল যেমন করেই হোক ওই বাঙালি ছেলেমেয়ে দুটিকে খুঁজে নিয়ে আসতে। পুলিশ যখন ওদের খুঁজছে তখন তারা কিছুতেই বেশিদূর যেতে পারবে না। নিজের সন্তানের মৃত্যুর বদলা নিয়ে তবে অন্য কথা। দুটো জিপ সঙ্গে-সঙ্গে দুদিকে বেরিয়ে গেল। তন্নতন্ন করে তারা খুঁজতে লাগল শহরের সব অলিগলি। তারপর রাত হলে বেরিয়ে পড়ল একদল দার্জিলিং-এর পথে আর একদল শিলিগুড়ির দিকে। প্রতিটি লোকই নিরুত্তাপ কিন্তু নির্দয়।

কার্শিয়াং থানায় বসে প্রথমে পুলিশ এসব টের পায়নি। দার্জিলিং-এর অফিসার বললেন, 'আমার বিশ্বাস সুনীলের বাবা মিথ্যে কথা বলছে। ওরা এখানেই এসেছিল এবং সুনীল ওদের নিয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে। কোথায় যেতে পারে? এক, শিলিগুড়িতে নেমে যেতে পারে। ওখানকার পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া হোক যাতে প্রতিটি হোটেলে সার্চ করে।

স্বপ্নেন্দুর খুব অসহায় লাগছিল! তিনি জানেন তাঁর স্ত্রী মনের জোরে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছেন। এই ছুটোছুটি সহ্য করার মতো শরীর তাঁর নয়। এখন তিনি কী

করবেন। এইসময় একটি লোক এসে খবর দিল সুনীল প্রধানদের দুটো জিপ দার্জিলিং-এর দিকে ছুটে গেল। পানবাহার দোকানের মালিক বলছে যে ছেলেমেয়েদুটো সন্ধের ট্রেনে উঠেছে। এখান থেকে আর একটা খবর কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে যে সুনীল প্রধান নাকি খুন হয়েছে। ওই জিপ যাচ্ছে বদলা নিতে। সঙ্গে-সঙ্গে সাজ-সাজ পড়ে গেল। দার্জিলিং-এর অফিসার কার্শিয়াং-এর অফিসারকে বললেন সুনীলের ব্যাপারটা সত্যি কি না খবর নিতে।

একটু বাদেই দার্জিলিং-এর উদ্দেশ্যে দুটো জিপ বেরিয়ে এল থানা থেকে। অফিসার প্রথমে স্বপ্নেন্দুদের সঙ্গে নিতে চাইছিলেন না, কিন্তু ওঁর পীড়াপীড়িতে রাজি হলেন। পুলিশের লক্ষ এখন জিপ।

এঁকেবেঁকে ট্রেনটা চলছিল, এই প্রথম ওরা দার্জিলিং-এর টয়ট্রেনে উঠল, অথচ ওদের দুজনেরই মনে হচ্ছিল কেন সেই দার্জিলিং মেইলের মতো এই ট্রেনটা হুহু করে ছুটছে না। ট্রামের চেয়েও অল্প স্পিডে গড়িয়ে-গড়িয়ে পাহাড়ে উঠেছে গাড়িটা। মাঝে-মাঝে যখন আবার পিছিয়ে যাচ্ছে দম নিতে তখন এক ধরনের ভয় এসে জমছে, ওরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কার্শিয়াং থেকে পালাতে চায়।

বাইরে এখন চুরচুরে কুয়াশা। অন্ধকার সেই কুয়াশা মিশে গিয়ে একটা ঘোলাটে সমুদ্র হয়ে গিয়েছে। সুর্মা অতীনের দিকে তাকাল। কার্শিয়াং ছাড়াবার পর থেকেই কেমন চুপ করে গেছে ও। সমস্ত ঘটনা শোনার পর ওর দুটো হাত ধরে শুধু বলেছিল 'তুই ঠিক করেছিস, ঠিক করেছিস।'

কিন্তু তাতে সান্ত্বনা পায়নি সুর্মা। মনের মধ্যে বিঁধে থাকা কাঁটাটা দপদপাচ্ছিল। সে খুন করল শেষ পর্যন্ত! খুনই তো! ছেলেটার মাথা থেকে যেভাবে রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়েছে তাতে খুন ছাড়া কী হতে পারে! ও যদি সুনীলকে বুঝিয়ে বলত তাহলে সুনীল কি শান্ত হতো না! হঠাৎ সমস্ত শরীরে কনকনে বাতাস লাগল যেন। ও অতীনের হাত চেপে ধরল, 'এই অতীন, খুন করলে ফাঁসি হয়, না রে?'

অতীন তাকাল, 'কী বাজে বকছিস!' হঠাৎ তার মাথার ভেতরে দ্রিমি-দ্রিমি শব্দ শুরু হল।

'সত্যি করে বল না। খুন করলে ফাঁসি হয়?'

'তুই খুন করেছিস কে বলল? সুনীল তো বেঁচেও যেতে পারে। তাছাড়া কী প্রমাণ আছে যে তুই খুন করেছিস? কে দেখেছে? পুলিশ যদি আমাদের ধরে তবেই তো এসব কথা উঠবে। সে আমি ম্যানেজ করে নেব।'

'কী করে?'

'মিথ্যে কথা বলে। তুই তো জানিস আমি খুব সুন্দর মিথ্যে কথা বলি।' সুর্মা ওর দিকে তাকাল। ওর খুব কান্না পাচ্ছিল। ও মনে-মনে চাইছিল সুনীল যেন কোনও বিপদে না পড়ে।

ঠিক তখনই একটা জিপের হেডলাইটের আলো এসে পড়ল ট্রেনের গায়ে। কুয়াশার জন্যে দেখা যায়নি; আচমকা বাঁক পেরিয়ে জিপটা ট্রেনের ঠিক পাশে চলে এল। অতীন প্রথমে লক্ষ করেনি কিন্তু তিনটে লোক জিপ থেকে মুখ বের করে যেভাবে তাকাচ্ছে

তাতে সতর্ক হল। জিপটা সাঁ করে এগিয়ে যেতে ট্রেনটা থেমে গিয়ে খুব জোরে-জোরে হুইস্‌ল দিতে লাগল। অতীন মুখ বের করে দেখল ট্রেনের আলোয় জিপটাকে দেখা যাচ্ছে, ঠিক লাইনের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ওটাকে। টপাটপ কয়েকটা লোক নেমে এল টর্চ হাতে। এসে প্রথম কামরায় উঠে গেল। একটু বাদেই তারা নেমে এসে আবার দ্বিতীয় কামরায় উঠল।

অতীনের মাথার ভেতরটা টলে উঠল। পুলিশ! নিশ্চয়ই তাদের খুঁজতে এসেছে। না, কিছুতেই ধরা দেবে না ওরা! ও চট করে উঠে দাঁড়িয়ে সুর্মার হাত ধরে টানল, 'চল, পালাই, পুলিশ!' মাথার যন্ত্রণাটাকে আমল দিল না সে।

সুর্মাও লক্ষ করেছিল, ফ্যাঁসফেসে গলার বলল, 'কী হবে?'

'কিছু হবে না। এই পাহাড়ে কেউ আমাদের খুঁজে বের করতে পারবে না। চল, আর কথা বলার সময় নেই।' কামরায় অন্য যাত্রীদের অবাক করে চোখের সামনে দিয়ে ওরা লাফিয়ে পাশের রাস্তায় নামল। তারপর এক দৌড়ে উল্টোদিকের পাহাড়ের গায়ে চলে এল।

হয়তো আগে এই পথে ঝরনার জল গড়িয়ে আসত, কিন্তু এখন তার শুকনো দাগ ছাড়া কিছু নেই। অতীন সুর্মার হাত ধরে দ্রুত ওপরে উঠছিল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না প্রায়, সুর্মা একবার আছাড় খেতে-খেতে বেঁচে গেল। ওরা যখন বেশ কিছুটা ওপরে উঠে গেছে তখনই জিপটা ঘুরে এসে ঠিক ওদের নিচে দাঁড়াল। অতীন বুঝল ওদের পালানোটা ধরা পড়ে গেছে। এখনই ওরা পিছু ধাওয়া করবে। অনেক নিচে মানুষের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

অতীন সামনে তাকাতেই দেখল আকাশের মেঘ কেটে যাচ্ছে আর সেখানে একটা পানসে চাঁদ। তার ফিকে আলোয় চারধার সাদা। হঠাৎ ওর চারপাশে কেউ থাকল না। সেই যন্ত্রণাটা ফিরে এল মাথায়। আচমকা নিজের চুল খিমচে ধরে চিৎকার করে উঠল সে।

সুর্মা আর পারছিল না। এর মধ্যেই ওর পা থেকে রক্ত ঝরছিল। অতীনের চিৎকারে চমকে উঠে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে, চিৎকার করছিস কেন?'

অথচ অতীন জবাব দিল না। দ্রুত ছুটে গেল ওপরে। সেখানে পাহাড়টা আচমকা শেষ হয়ে কেমন সমান হয়ে গিয়েছে। সেই মসৃণ পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে অতীন আকাশের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে শুরু করল। সুর্মা বুঝতে পারছিল না অতীনের কী হয়েছে, এরকম আচরণ করছে কেন! সে মরিয়া হয়ে ছুটে এল ওপরে। ঠিক সেই সময় দুটো জিপ হেডলাইট জ্বালিয়ে এসে দাঁড়াল নিচে। সুর্মার কানে বোধহয় গুলির শব্দ এল। কিন্তু সেটিকে মন দেবার সময় ছিল না ওর। দুহাতে অতীনকে আঁকড়ে ধরে সে চিৎকার করে উঠল, 'অতীন, তুই এমন করছিস কেন? কী হয়েছে, বল?'

অতীন প্রচণ্ড শক্তিতে ওকে ঠেলে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর বিকৃত মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে ককিয়ে উঠল, 'আই লাভ ইউ সুর্মা।'

সুর্মা ছিটকে পড়েছিল পাথরের ওপর। অতীন যে তাকে এভাবে জোরে ঠেলে দেবে ভাবতে পারেনি। তার পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছিল। তবু সে উঠে দাঁড়াল তার দুহাত বাড়িয়ে কেঁদে উঠল, 'অতীন, তোর কী হয়েছে, এমন করছিস কেন?'

অতীন ঘুরে দাঁড়াল। তার ঘোলাটে চোখ সুর্মা দেখতে পেল না আবছা চাঁদের আলোয়। নিজের চুল মুঠোয় ধরে অতীন চিৎকার করল, 'আই লাভ ইউ সুর্মা।'

সুর্মা ছুটে গেল অতীনের কাছে। দুহাতে জড়িয়ে ধরল ওকে, তারপর হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল, 'অতীন, তোকে আমি ভালোবাসি। বিশ্বাস কর, এখন আমি তোকে ভালবাসি।'

অতীন আলিঙ্গনে ছটফট করছিল। তার মুখ এখনও আকাশের দিকে। সমস্ত শরীর উত্তপ্ত। সে বিড়বিড় করছিল, 'আই লাভ ইউ সুর্মা।'

সুর্মার সমস্ত শরীর যেন পাথর হয়ে গেল। ও হঠাৎ আবিষ্কার করল তার দুহাতের শক্ত আলিঙ্গনে আবদ্ধ থেকেও অতীন যেন তার কাছে নেই। সেই বদ্ধ উন্মাদ শরীরটার বুকে মাথা ঠুকতে-ঠুকতে ও প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'অতীন, কথা বল, আমি তোকে ভালোবেসেছি রে। অতীন, কথা বল।'

অনেক নিচে অন্ধকার রাস্তায় দুজন পুলিশের সঙ্গে দাঁড়ানো স্বপ্নেন্দু কিংবা সুর্মার মা এদের দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু সুর্মা ঘাড় ফেরালে হয়তো আবছা দেখতে পেত ওদের। উঠে আসা পুলিশের দল এর মধ্যেই বদলা নিতে আসা লোকগুলোকে কবজা করে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছিল ওপরে।

ওরা হঠাৎ দেখতে পেল পাহাড়ের একেবারে চুড়োয়, যার ওপাশে অতলান্ত খাদ, সেখানে উন্মত্ত একটি তরুণকে দুহাতে আঁকড়ে একটি প্রায় তরুণী কাঁদছে। উন্মাদ চিৎকার করে উঠল আচমকা, 'সুনীলকে আমিই মেরেছি, আমি, আই লাভ ইউ সুর্মা।' এবার মেয়েটি যেন প্রচণ্ড বিস্ময়ে ধীরে-ধীরে মাটিতে ভেঙে পড়ে হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। তরুণটি তখনও সম্রাটের মতো চিৎকার করছিল, 'আই লাভ ইউ সুর্মা।' খোলা আকাশে শব্দগুলো যেন তার সাম্রাজ্য বিস্তার করছিল।